প্রাগৈতিহাসিক



মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দেড়টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাগৈতিহাসিক

সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে। আষাঢ় মাসের প্রথমে বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদীতে ডাকাতি করিতে গিয়া তাহাদের দলকে দল ধরা পড়িয়া যায়। এগার জনের মধ্যে কেবল ভিখুই কাঁধে একটা বর্ষার খোঁচা খাইয়া পলাইতে পারিয়াছিল। রাতারাতি দশ মাইল দূরের মাথা-ভাঙা পুলটার নীচে পৌঁছিয়া অর্দ্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবাইয়া শরবনের মধ্যে দিনের বেলাটা লুকাইয়া ছিল। রাত্রে আরও ন'ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একেবারে পেহ্লাদ বাগ্দীর বাড়ী চিতনপুরে।

পেহ্লাদ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই।

কাঁধটা দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'ঘাও থান সহজ লয় স্যাঙ্গাৎ। উটি পাকবো। গা ফুলবো। জানাজানি হইয়া গেলে আমি কনে' যামু? খুনটো যদি না করতিস্—'

'তরেই খুন করতে মন লইতেছে পেহ্লাদ।'

'এই জন্মে লা, স্যাঙ্গাৎ'। বন কাছেই ছিল, মাইল পাঁচেক উত্তরে। ভিখু অগত্যা বনেই আশ্রয় লইল। পেহ্লাদ নিজে বাঁশ কাটিয়া বনের একটা দুর্গম অংশে সিন্‌জুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাচা বাঁধিয়া দিল। তালপাতা দিয়া একটা আচ্ছাদনও করিয়া দিল। বলিল, 'বাদলায় বাঘ টাঘ সব পাহাড়ের উপরে গেছেগা। সাপে যদি না কাটে ত আরাম কইরাই থাকবি ভিখু।'

'খামু কি?'

'চিড়া গুড় দিলাম যে? দু'দিন বাদে বাদে ভাত লইয়া আসুম। রোজ আইলে মাইন্‌যে সন্দ করব।'

কাঁধের ঘা'টা লতা পাতা দিয়া বাঁধিয়া আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া পেহ্লাদ চলিয়া গেল। রাত্রে ভিখুর জ্বর আসিল। পরদিন টের পাওয়া গেল পেহ্লাদের কথাই ঠিক, কাঁধের ঘা ভিখুর ফুলাইয়া উঠিয়াছে। ডান হাতটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে এবং হাতটি তাহার নাড়িবার সামর্থ্য নাই।

বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না এমনি অবস্থায় সেই বনে জলে ভিজিয়া মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া, দেহের কোন না কোন অংশ হইতে ঘণ্টায় একটি করিয়া জোঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দু'দিন দু'রাত্রি সঙ্কীর্ণ মাচাটুকুর উপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাঁট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল, রোদের সময় ভাপ্সা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল, পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার একমুহূর্ত্তের স্বস্তি রহিল না। পেহ্লাদ কয়েকটা বিড়ি দিয়া গিয়াছিল সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তিন চার দিনের মত চিড়া আছে বটে কিন্তু গুড় একটুও নাই। গুড় ফুরাইয়াছে, কিন্তু গুড়ের লোভে যে লাল পিঁপড়াগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহারা এখনো মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে। ওদের হতাশার জ্বালা ভিখুই অবিরত ভোগ করিতেছে সর্ব্বাঙ্গে।

মনে মনে পেহ্লাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। যেদিন পেহ্লাদের আসিবার কথা সেদিন সকালে কলসীর জলটাও তাহার ফুরাইয়া গেল। বিকাল পর্য্যন্ত পেহ্লাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া কলসীটা লইয়া সে যে কত কষ্টে

খানিক দূরের নালা হইতে আধ কলসী জল ভরিয়া আনিয়া আবার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না। অসহ্য ক্ষুধা পাইলে শুধু চিড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। একহাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়া গুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারি দিকে লাগাইয়া দিল। সবুজরঙের একটা সাপকে একবার মাথার কাছে সিন্দুরি গাছের পাতার ফাঁকে উঁকি দিতে দেখিয়া পূবা দু'ঘণ্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পর দু'এক ঘণ্টা অন্তরই চারিদিকের ঝোপে ঝপাঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া মুখে যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তাড়াইতে লাগিল।

মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচিবেই।

পেহ্লাদ গ্রামান্তরে কুটুম বাড়ী গিয়াছিল। পরদিনও সে আসিল না। কুটুমবাড়ীর বিবাহোৎসবে তাড়ি টানিয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিল। বনের মধ্যে ভিখু কি ভাবে দিন রাত্রি কাটাইতেছে তিন দিনের মধ্যে সে কথা একবার তাহার মনেও পড়িল না।

ইতিমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীরও তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে। জ্বরটা একটু কমিয়াছে বটে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম ছুটানো তাড়ির নেশার মতই ভিখুকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর এখন ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না। জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মত ফুলিয়া উঠিয়া আপনা

হইতেই নীচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় জলের কলসীটা এক সময় নীচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুঁটুলির মধ্যে চিড়াগুলি পচিতে আরম্ভ করে, রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার আশে পাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুটুম বাড়ী হইতে ফিরিয়া বিকালের দিকে ভিখুর খবর লইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া পেহ্লাদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। ভিখুর জন্ত এক বাটি ভাত ও কয়েকটা পুঁটি মাছ ভাজা আর একটু পুঁই চচ্চড়ি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ও-গুলি সে নিজেই খাইয়া ফেলিল। তারপর বাড়ী গিয়া বাঁশের একটা ছোট মই এবং তাহার বোনাই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মইএ শোয়াইয়া তাহারা দুজনে ভিখুকে বাড়ী লইয়া গেল। ঘরের মাচার উপরে খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল।

আর এমনি শক্ত প্রাণ ভিখুর যে শুধু এই আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও এক রকম বিনা যত্নেই একমাস মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভাল হইল না। গাছের মরা ডালের মত শুকাইয়া গিয়া অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। প্রথমে অতি কষ্টে হাতটা সে একটু নাড়িতে পারিত কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে ক্ষমতাটুকুও তাহার নষ্ট হইয়া গেল।

কাঁধের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর বাড়ীতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত না থাকিলে ভিখু তাহার একটি মাত্র হাতের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে বাঁশের মই বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

পেহ্লাদ সে সময় বাড়ী ছিল না, ভরতের সঙ্গে তাড়ি গিলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পেহ্লাদের বোন গিয়াছিল ঘাটে। পেহ্লাদের বৌ ছেলেকে ঘরে শোয়াইতে আসিয়া ভিখুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পালাইয়া যাইতেছিল, ভিখু তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু পেহ্লাদের বৌ বাগ্দীর মেয়ে। দুর্ব্বল শরীরে বাঁ হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া সে গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল। পেহ্লাদ বাড়ী ফিরিলে সব বলিয়া দিল।

তাড়ির নেশায় পেহ্লাদের মনে হইল, এমন নেমকহারাম মানুষটাকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা বৌ-এর পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিয়া ভিখুর মাথা ফাটাইতে গিয়া নেশার মধ্যেও কিন্তু টের পাইতে তাহার বাকী রহিল না যে কাজটা যত বড় কর্ত্তব্যই হোক্, সম্ভব একেবারেই নয়। ভিখু তাহার ধারাল দা'টি বাঁ হাতে শক্ত করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং খুনো খুনির পরিবর্ত্তে তাহাদের মধ্যে কিছু অশ্লীল কথার আদান প্রদান হইয়া গেল।

শেষে পেহ্লাদ বলিল, 'তোর লাইগ্যা আমার সাত টাকা খরচ

গেছে, টাকাটা দে, দিয়া বাইর' আমার বাড়ীর থেইকা,—দূর হ'।'

ভিখু বলিল, 'আমার কোমরে একটা বাজু বাইন্ধা রাখছিলাম, তুই চুরি করছস। আগে আমার বাজু ফিরাইয়া দে, তবে যামু।'

'তোর বাজুর খপর জানে কেডা রে' ?'

'বাজু দে কইলাম পেহ্লাদ, ভাল চাসত! বাজু না দিলি সা' বাড়ীর মেজোকর্ত্তার মত গলাডা তোর একখান কোপেই দুই ফাঁক কইরা ফেলুম, এই তোরে আমি কইয়া রাখলাম। বাজু পালি' আমি অখনি যামু গিয়া।' কিন্তু বাজু ভিখু ফেরত পাইল না। তাহাদের বিবাদের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দু'জনে মিলিয়া ভিখুকে তাহারা কায়দা করিয়া ফেলিল। পেহ্লাদের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া দেওযা ছাড়া দুর্ব্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। পেহ্লাদ ও তাহার বোনাই তাহাকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া ফেলিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। ভিখুর শুকাইয়া আসা ঘা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল, হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ধুঁকিতে ধুঁকিতে সে চলিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে সে কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু দুপুর রাতে পেহ্লাদের ঘর জ্বলিয়া উঠিয়া বাগ্দী পাড়ায় বিষম হৈ চৈ বাধাইয়া দিল।

পেহ্লাদ কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'হায় সব্বনাশ, হায় সব্বনাশ! ঘরকে আমার শনি আইছিলো গো, হায় সব্বনাশ।'

কিন্তু পুলিশের টানাটানির ভয়ে মুখ ফুটিয়া বেচারী ভিখুর নামটা পর্য্যন্ত করিতে পারিল না।

সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম, অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হইল। চিতলপুরের পাশে একটা নদী আছে। পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া একটা জেলে ডিঙ্গি চুরি করিয়া ভিখু নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। লগি ঠেলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, একটা চ্যাপ্টা বাঁশকে হালের মত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সে সমস্ত রাত কোন রকমে নৌকার মুখ সিধা রাখিয়াছিল। সকাল হওয়ার আগে শুধু স্রোতের টানে সে বেশীদুর আগাইতে পারে নাই।

ভিখুর মনে আশঙ্কা ছিল ঘরে আগুন দেওয়ার শোধ লইতে পেহ্লাদ হয় ত তাহার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে, মনের জ্বালায় নিজের অসুবিধার কথাটা ভাবিবে না। পুলিশ বহুদিন যাবত তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়ীতে খুনটা হওয়ার ফলে চেষ্টা তাহাদের বাড়িয়াছে বই কমে নাই। পেহ্লাদের কাছে খবর পাইলে পুলিশ আশে পাশে চারিদিকেই তাহার খোঁজ করিবে। বিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যে লোকালয়ে মুখ দেখানো তাহার পক্ষে বিপদের কথা। কিন্তু ভিখু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কাল বিকাল হইতে সে কিছু খায় নাই। দু'জন যোযান মানুষের হাতে বেদম মার খাইয়া এখনো দুর্ব্বল শরীরটা তাহার ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। ভোর ভোর মহকুমা সহরের ঘাটের সামনে পৌঁছিয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইল! নদীর জলে ডুবিয়া ডুবিয়া স্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া সহরের ভিতরে প্রবেশ করিল। ক্ষুধায় সে চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। একটি পয়সাও তাহার সঙ্গে নাই সে মুড়ি কিনিয়া খায়। বাজারের

রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, 'দু'টো পয়সা দিবান কর্ত্তা ?'

তাহার মাথার জটবাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মত ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া আর দড়ির মত শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখিয়া ভদ্রলোকটির বুঝি দয়াই হইল। তিনি তাহাকে একটি পয়সা দান করিলেন।

ভিখু বলিলেন—'একটা দিলেন বাবু? আর একটা দেন।'

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন—'একটা দিলাম, তাতে হল না,—ভাগ্!'

একমুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল ভিখু বুঝি তাহাকে একটা বিশ্রী গালই দিয়া বসে। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিল। গাল দেওয়ার বদলে আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইয়া সামনের মুড়ি মুড়কির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল।

সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতে খড়ি।

কয়েক দিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহুপুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইন কানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্ম ভিখারীর মত আয়ত্ত হইয়া গেল। শরীর এখন আর সে একেবারেই সাফ করে না, মাথার চুল তাহার ক্রমেই জট বাঁধিয়া বাঁধিয়া দলা দলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন-পরিবার দিনের পর দিন বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু মাঝে মাঝে খ্যাপার মত দুই হাতে মাথা চুলকায় কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে ভরসা পায় না। ভিক্ষা

করিয়া সে একটি ছেঁড়া কোট পাইয়াছে, কাঁধের ক্ষতচিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গুমোটের সময়েও কোটটা সে গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সবচেয়ে জোরাল বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোটের ডানদিকের হাতাটি সে তাই বগলের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে। একটি টিনের মগ ও একটা লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেঁতুল গাছের নীচে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। সকালে একপয়সার মুড়ি খাইয়া নেয়, দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বটগাছের নীচে ইটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত রান্না করে, মাটির মালসায় কোন দিন রাঁধে ছোটমাছ কোনদিন তরকারী। পেট ভরিয়া খাইয়া বটগাছটাতেই হেলান দিয়া বসিয়া আরামে বিড়ি টানে। তারপর আবার তেঁতুল গাছটার নীচে গিয়া বসে।

·· সারাটা দিন শ্বাস টানা' শ্বাস টানা' কাতরানির সঙ্গে সে বলিয়া যায় : হেই বাবা একটা পয়সা : আমায় দিলে ভগবান দিবো : হেই বাবা একটা পয়সা—

অনেক প্রাচীন বুলির মত 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' শ্লোকটা আসলে অসত্য। সারা দিনে ভিখুর সামনে দিয়া হাজার দেড় হাজার লোক যাতায়াত করে এবং গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজন তাহাকে পয়সা অথবা আধলা দেয়। আধলার সংখ্যা বেশী হইলে সারাদিনে ভিখুর পাঁচ ছ' আনা রোজগার হয়,

কিন্তু সাধারণতঃ তাহার উপার্জ্জন আট আনার কাছাকাছি থাকে। সপ্তাহে এখানে দু'দিন হাট বসে। হাটবারের উপার্জ্জন তাহার একটি পুরা টাকার নীচে নামে না।

এখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নদীর দু'তীর কাশে শাদা হইয়া উঠিয়াছে। নদীর কাছেই বিন্নু মাঝির বাড়ীর পাশের ভাঙা চালাটা ভিখু মাসিক আট আনায় ভাড়া করিয়াছে। রাত্রে সে ওইখানেই শুইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ায় মৃত এক ব্যক্তির জীর্ণ কিন্তু পুরু একটি কাঁথা সে সংগ্রহ করিয়াছে, লোকের বাড়ীর খড়ের গাদা হইতে চুরি-করিয়া-আনা খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথাটি পাতিয়া সে আরাম করিয়া ঘুমায়। মাঝে মাঝে সহরের ভিতরে গৃহস্থবাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গিয়া সে কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় পাইয়াছে। তাই পুঁটলি করিয়া বালিসের মত ব্যবহার করে। রাত্রে নদীর জলো-বাতাসে শীত করিতে থাকিলে পুঁটুলি খুলিয়া একটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয়।

সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্ব্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংস-পেশী নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। অভ্যস্ত বুলি আওড়াইয়া কাতরভাবেই সে এখনো ভিক্ষা চায় কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না। পথে লোকজন না থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন পথিককে সে অশ্লীল গাল দিয়া বসে। এক পয়সার জিনিস কিনিয়া ফাউ না পাইলে দোকানীকে মারিতে

উঠে। নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুসী হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে।

রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে।

নারী-সঙ্গ-হীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভাল লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনা-বহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে।

তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গিলিয়া সে হল্লা করিত, টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত, আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ী চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিত, মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর সেই আর্ত্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আর কি আছে? পুলিশের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া বেড়াইয়া আর বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল। তাহার দলের অনেকেই বার বার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছে কিন্তু জীবনে একবারের বেশী পুলিশ তাহার নাগাল পায় নাই। রাখু বাগ্দীর সঙ্গে পাহানার শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে যেবার সে চুরি করিয়াছিল সেইবার। সাতবছরের জন্য তাহার কয়েদ হইয়াছিল, কিন্তু দু'বছরের বেশী

কেহ তাহাকে জেলে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া সে পলাইয়াছিল। তারপর একা সে গৃহস্থবাড়ীতে ঘরের বেড়া কাটিয়া চুরি করিয়াছে, দিনে দুপুরে পুকুর-ঘাটে একাকিনী গৃহস্থ বধূর মুখ চাপিয়া গলার হার, হাতের বালা খুলিয়া লইয়াছে, রাখুর বৌকে সঙ্গে নিয়া নোয়াখালি হইয়া সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাতিয়ায়। ছ'মাস পরে রাখুর বৌকে হাতিয়ায় ফেলিয়া আসিয়া পর পর তিনবার তিনটা দল করিয়া দূরে দূরে কত গ্রামে যে ডাকাতি করিয়া বেড়াইয়াছে তাহার সবগুলির নামও এখন তাহার স্মরণ নাই। তারপর এই সেদিন বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইটার গলাটা যে দা'য়ের এক কোপে দু'ফাঁক করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

কি জীবন তাহার ছিল, এখন কি হইয়াছে!

মানুষ খুন করিতে যাহার ভাল লাগিত সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটু টিটকারি দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে। দেহের শক্তি তাহার এখনো তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শক্তি প্রয়োগ করিবার উপায়টাই তাহার নাই। কত দোকানে গভীর রাত্রে সামনে টাকার থোক সাজাইয়া একা বসিয়া দোকানী হিসাব মেলায়, বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা। এদিকে, ধারালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়লোক হওয়ার পরিবর্ত্তে বিনু মাঝির চালাটার নীচে সে চুপচাপ শুইয়া থাকে।

ডান হাতটাতে অন্ধকারে হাত বুলাইয়া ভিখুর আপ্‌শোষের

সীমা থাকে না। সংসারের অসংখ্য ভীরু ও দুর্ব্বল নরনারীর মধ্যে এতবড় বুকের পাটা আর এমন একটা জোরালো শরীর নিয়া শুধু একটা হাতের অভাবে সে যে মরিয়া আছে। এমন কপালও মানুষের হয়?

তবু এ দুর্ভাগ্য সে সহ্য করিতে পারে। আপ্‌শোষেই নিবৃত্তি। একা ভিখু আর থাকতে পারে না।

বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখারিণী ভিক্ষা করিতে বসে। বয়স তাহার বেশী নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।

এই ঘায়ের জোরে সে ভিখুর চেয়ে বেশী রোজগার করে। সে জন্য ঘা'টিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না।

ভিখু মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহার কাছে বসে। বলে, 'ঘা'টি সারবো না, লয়?'

ভিখারিণী বলে 'খুব! অসুদ দিলে অখনি সারে।'

ভিখু সাগ্রহে বলে 'সারা তবে, অসুদ দিয়া চটপট সারাইয়া ল। ঘা'টি সারলে তোর আর ভিক্ মাগতি অইবো না,—জানস্? আমি তোরে রাখুম।'

'আমি থাকলি'ত।'

'ক্যান? থাকবি না ক্যান? খাওয়ামু পরামু, আরামে রাখুম, পায়ের পরনি পা'টি দিয়া গাঁট হইয়া বইয়া থাকবি। না করস্ তুই বিয়ের লেগে?'

অত সহজে ভুলিবার মেয়ে ভিখারিণী নয়। খানিকটা

তামাকপাতা মুখে গুঁজিয়া সে বলে, 'দু'দিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা'টি মুই তখন পামু কোয়ানে ?'

ভিখু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা ক'রে, সুখে রাখিবার লোভ দেখায়। কিন্তু ভিখারিণী কোনমতেই রাজী হয় না। ভিখু ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসে।

এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, নদীতে জোয়ার ভাঁটা বয়, শীতের আমেজ বায়ুস্তরে মাদকতা দেখা দেয়। ভিখুর চালার পাশে কলাবাগানে চাঁপা-কলার কাঁদি শেষ হইয়া আসে। বিন্নু মাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বৌকে রূপার গোট কিনিয়া দেয়। তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরালো ও জমাট হইয়া ওঠে। ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায়। নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারে না!

একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখারিণীর কাছে যায়। বলে 'আইচ্ছা, ল, ঘা লইয়াই চল্।'

ভিখারিণী বলে—'আগে আইবার পার নাই ? যা, অখন মর গিয়া, আখার তলের ছালি খা গিয়া।'

'ক্যান ?' ছালি খাওনের কথাডা কি ?'

'তোর লাইগা হাঁ কইরা বইসা আছি ভাবছস তুই, বটে ? আমি উই উয়ার সাথে রইছি।'

ওদিকে তাকাইয়া ভিখু দেখিতে পায় তাহারই মত জোয়ান দাড়িওলা এক খঞ্জ ভিখারী খানিক তফাতে আসন করিয়াছে। তাহার ডান হাতটির মত ওর একটি পা হাঁটুর নীচে শুকাইয়া গিয়াছে, বিশেষ যত্নসহকারে এই অংশটুকু

সামনে মেলিয়া রাখিয়া সে আল্লার নামে সকলের দয়া প্রার্থনা করিতেছে।

পাশে পড়িয়া আছে কাঠের একটা কৃত্রিম হ্রস্ব পা।

ভিখারিণী আবার বলিল—'বসস্ যে? যা, পালাইয়া যা, দেখলি খুন কইরা ফেলাইবো কইয়া দিলাম।'

ভিখু বলে 'আরে থো, খুন, অমন সব হালাই করতিছে। উয়ার মত দশটা মাইন্ষেরে আমি একা ঘায়েল কইরা দিবার পার্তাম, তা জানস্?'

ভিখারিণী বলে—'পারস্ তো যানা, উয়ার সাথে লাগ না গিয়া। আমার কাছে কি?'

'উয়াকে তুই ছাড়ান দে। আমার কাছে চ'।'

'ইরে সোণা! তামুক খাবা? যা দেইখা পিছাইছিলি, তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত? উয়ারে ছাড়ুম ক্যান? উয়ার মত কামাস তুই? ঘর আছে তোর? ভাগবি তো ভাগ, নাইলে গাল দিমু কইলাম।'

ভিখু তখনকার মত প্রস্থান করে কিন্তু হাল ছাড়ে না। ভিখারিণীকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে 'তোর নামটো কির‍্যা?'

এমনি তাহারা পরিচয়হীন যে এত কাল পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও তাহারা বোধ করে নাই।

ভিখারিণী কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে।

'ফের লাগতে আইছস্? হোই ও বুড়ীর কাছে যা।' ভিখু তাহার কাছে উবু হইয়া বসে। পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা

দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া বেড়ায়। ঝুলির ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড মর্ত্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিণীর সামনে রাখিয়া বলে 'খা। তোর লেগে চুরি কইরা আনছি।'

ভিখারিণী তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে। খুসী হইয়া বলে 'নাম শুন্‌বার চাস? পাঁচী কয় মোরে,—পাঁচী। তুই কলা দিছস্, নাম কইলাম, এবারে ভাগ।'

ভিখু উঠিবার নাম করে না। অতবড় একটা কলা দিয়া শুধু নাম শুনিয়া খুসী হওয়ার মত সৌখীন সে নয়। যতক্ষণ পারে ধূলার উপর উবু হইয়া বসিয়া পাঁচীর সঙ্গে সে আলাপ করে। ওদের স্তরে নামিয়া না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। মনে হইবে পরস্পরকে তাহারা যেন গাল দিতেছে! পাঁচীর সঙ্গীটির নাম বসির। তাহার সঙ্গেও সে একদিন আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল।

'সেলাম মিয়া।'

বসির বলিল—'ইদিকে ঘুরাফিরা কি জন্ম? সেলাম মিয়া হতিছে! লাঠির একঘায়ে শিরটি ছেঁচ্যা দিমু নে।'

দুজনে খুব খানিকটা গালাগালি হইয়া গেল। ভিখুর হাতে লাঠি ও বসিরের হাতে মস্ত একটা পাথর থাকায় মারামারিটা আর হইল না।

নিজের তেঁতুল গাছের তলায় ফিরিয়া যাওয়ার আগে ভিখু বলিল, 'র', তোরে নিপাত করতেছি।'

বসির বলিল,—'ফের উয়ার সাথে বাতচিত করলি' জানে মাইরা দিমু, আল্লার কিরে।'

এই সময় ভিখুর উপার্জ্জন কমিয়া আসিল।

পথ দিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন লোক যাতায়াত করে না। একেবারে প্রথমবারের জন্ম যাহারা পথটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন পথিকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা তুই মাসের ভিতরেই মুষ্টিমেয় হইয়া আসে। ভিখুকে একবার যাহারা একটি পয়সা দিয়াছে পুনরায় তাহাকেই দান করিবার প্রয়োজন তাহাদের অনেকেই বোধ করে না। সংসারে ভিখারীর অভাব নাই।

কোন রকমে ভিখুর পেট চলিতে লাগিল। হাটবার ছাড়া রোজগারের একটি পয়সাও সে বাঁচাইতে পারিল না। সে ভাবনায় পড়িয়া গেল।

শীত পড়িলে খোলা চালার নীচে থাকা কষ্টকর হইবে। যেখানে হোক চারিদিক ঘেরা যেমন-তেমন ঘর একখানা তাহার চাই। মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই আর তুবেলা খাইতে না পাইলে কোন যুবতী ভিখারিণীই তাহার সঙ্গে বাস করিতে রাজী হইবে না। অথচ উপার্জ্জন তাহার যেভাবে কমিয়া আসিতেছে এভাবে কমিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই হয় ত সে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না।

যে ভাবেই হোক আয় তাহাকে বাড়াইতেই হইবে।

এখানে থাকিয়া আয় বাড়াইবার কোন উপায়ই সে দেখিতে পায় না। চুরি ডাকাতির উপায় নাই, মজুর খাটিবার উপায় নাই,

একেবারে খুন করিয়া না ফেলিলে কাহারও কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া একহাতে সম্ভব নয়। পাঁচীকে ফেলিয়া এই সহর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার চালার পাশে বিন্নু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জ্জরিত করিয়া দেয়। এক-এক দিন বিন্নুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্ম মন ছটফট করিয়া ওঠে। নদীর ধারে খ্যাপার মত ঘুরিতে ঘুরিতে মাঝে মাঝে তাহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।

আরও কিছুকাল ভিখু এমনি অসন্তোষের মধ্যে কাটাইয়া দিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুলির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ভরিয়া জমানো টাকা কটি কোমরের কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ভিখু তাহার চালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একদিন সে হাতথানেক লম্বা একটা লোহার শিক কুড়াইয়া পাইয়াছিল। অবসর মত পাথরে ঘষিয়া ঘষিয়া শিকটির একটা মুখ সে চোখা করিয়াছে। এই অস্ত্রটিও সে ঝুলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে লইল।

অমাবস্তের অন্ধকারে আকাশভরা তারা তখন ঝিকমিক করিতেছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। বহুকাল পরে মধ্য-রাত্রির জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা নিয়া বিচরণ করিতে বাহির হইয়া ভিখুর সহসা অকথনীয় উল্লাস বোধ

হইল। নিজের মনে অস্ফুটস্বরে সে বলিয়া উঠিল 'বাঁ টি লইয়া ডানটিরে যদি রেহাই দিতা ভগমান!'

নদীর ধারে ধারে আধমাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া সে সহরে প্রবেশ করিল। বাজার বাঁ হাতি রাখিয়া ঘুমন্ত সহরের বুকে ছোট ছোট অলিগলি দিয়া সহরের অপরপ্রান্তে গিয়া পৌছিল। সহরে যাওয়ার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া সহর হইতে বাহির হইয়াছে। নদী ঘুরিয়া আসিয়া দু'মাইল তফাত এই রাস্তারই পাশে পাশে মাইল খানেক রহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণে দিক পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

কিছুদূর পর্য্যন্ত রাস্তার দু'দিকে ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি বাড়ী চোখে পড়ে। তার পর ধানের ক্ষেত ও মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙ্গার দেখা পাওয়া যায়। এমনি একটা জঙ্গলের ধারে খানিকটা জমি সাফ করিয়া পাঁচ সাতখানা কুঁড়ে তুলিয়া কয়েকটা হতভাগা মানুষ একটি দরিদ্রতম পল্লী স্থাপিত করিয়াছে। তার মধ্যে একটি কুঁড়ে বসিরের। ভোরে উঠিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দে কাঠের পা ফেলিয়া সে সহরে ভিক্ষা করিতে যায়, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। পাঁচী গাছের পাতা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধে, বসির টানে তামাক। রাত্রে পাঁচী পায়ের ঘা'য়ে ন্যাকড়ার পটি জড়ায়। বাঁশের খাটে পাশাপাশি শুইয়া তাহাদের কাটা কাটা কদর্য্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাদের নীড় তাহাদের শয্যা ও তাহাদের দেহ হইতে একটা ভাপ্সা পচা দুর্গন্ধ উঠিয়া খড়ের চালের ফুটা দিয়া বাহিরের বাতাসে মিশিতে থাকে।

ঘুমের ঘোরে বসির নাক ডাকায়। পাঁচী বিড় বিড় করিয়া বকে!

ভিখু একদিন ওদেব পিছু পিছু আসিয়া ঘর দেখিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে সাবধানে ঘরের পিছনে গিয়া বেড়ার ফাঁকে কান পাতিয়া সে কিছুক্ষণ কচু বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ঘুরিয়া ঘরের সামনে আসিল। ভিখারীর কুঁড়ে, দরজার ঝাঁপটি পাঁচী ভিতর হইতে বন্ধ করে নাই, শুধু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ঝাঁপটা সন্তর্পণে একপাশে সরাইয়া দিয়া ঝুলির ভিতর হইতে শিকটা বাহির করিয়া শক্ত করিয়া ধরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে তারার আলো ছিল, ঘরের ভিতরে সেটুকু আলোরও অভাব। দেশলাই জ্বালিবার অতিরিক্ত হাত নাই; ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিখু ভাবিয়া দেখিল বসিরের হৃদপিণ্ডের অবস্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বাঁ হাতের আঘাত, ঠিক জায়গামত না পড়িলে বসির গোলমাল করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাতে মুস্কিল অনেক।

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বসিরের শিয়রের কাছে সরিয়া গিয়া একটিমাত্র আঘাতে ঘুমন্ত লোকটার তালুর মধ্যে শিকের চোখা দিকটা সে প্রায় তিন আঙ্গুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। অন্ধকারে আঘাত কতদূর মারাত্মক হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। শিকটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে টের পাইয়াও ভিখু তাই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একহাতে সবলে বসিরের গলা চাপিয়া ধরিল।

পাচীকে বলিল 'চুপ থাক্ঃ চিল্লাবিতো তোরেও মাইরা ফেলামু।

পাঁচী চেঁচাইল না, ভয়ে গোঙাইতে লাগিল।

ভিখু তখন আবার বলিল 'একটকু আওয়াজ লয়, ভালা চাস ত একদম চুপ মাইরা থাক্।'

বসির নিস্পন্দ হইয়া গেলে ভিখু তাহার গলা হইতে হাত সরাইয়া নিল।

দম নিয়া বলিল 'আলোটা জ্বাইলা দে, পাঁচী।'

পাঁচী আলো জ্বালিলে ভিখু পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কীর্ত্তি চাহিয়া দেখিল। একটী মাত্র হাতের সাহায্যে অমন যোয়ান মানুষটাকে ঘায়েল করিয়া গর্ব্বের তাহার সীমা ছিল না। পাঁচীর দিকে তাকাইয়া সে বলিল,—'দেখছস্? কেডা কারে খুন করল দেখছস্? তখন পই পই কইরা কইলাম; মিয়াবাই ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার লারবা গো, ছারান দেও। শুইনে মিযাবায়ের অইল গোসা! কয় কিনা, শির ছেঁচ্চ্যা দিমু। দেন গো দেন, শিরটা আমার ছেঁচ্যাই দেন মিয়াবাই—' বসিরের মৃতদেহের সামনে ব্যঙ্গভরে মাথাটা একবার নত করিয়া ভিখু মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'ঠ্যারাইন বোবা ক্যান গো? আরে কথা ক' হাড়হাবাইতা মাইয়া! তোরেও দিমু নাকি সাবার কইরা,—অ্যাঁ?'

পাঁচী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—'ইবারে কি করবি?'

'ত্যাখ কি করি! পয়সা করি ক'নে শুইনা রাখছে, আগে তাই ক।'

বসিরের গোপন সঞ্চয়ের স্থানটি পাঁচী অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছিল। ভিখুর কাছে প্রথমে সে অজ্ঞতার ভাণ করিল।

কিন্তু ভিখু আসিয়া চুলের মুটি চাপিয়া ধরিলে প্রকাশ করিতে পথ পাইল না।

বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্ব্বে ইহার চেয়ে বেশী উপার্জ্জন করিয়াছে। তবু সে খুসী হইল। বলিল 'কি কি নিবি পুঁটলি বাঁইধা ফ্যালা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমির চাঁদ উঠবো, আলোয় আলোয় পথটুকু পার হমু।'

পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল 'অখনই চাঁন্দ উটবো পাঁচী।'

পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'

'সদর। ঘাটে না' চুরি করুম। বিযানে ছিপতিপুরের সামনে জংলার মধ্যি ঢুইকা থাকুম রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাটন লাগব।'

পায়ের ঘা নিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা একসময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, 'পায়ে নি তুই ব্যথা পাস্ পাঁচী?'

'হ', ব্যথা জানায়।'

'পিঠে চাপামু?'

'পারবি ক্যান?'

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথের দু'দিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোর নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয় ত ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্য্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।

চোর

আকস্মিক বর্ষায় ভিজিয়া ওঠা রাত্রি। বৈকালের মেঘশূন্য আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে নিবিড় হইয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। মধ্যরাত্রে নিদ্রিত নিঝুম গ্রামটির উপর সে মেঘ সহসা অবিরল ধারে গলিয়া পড়িতে সুরু করিল।

গ্রামের পাশ দিয়া একটা খাল বহিয়া গিয়া রসুলপুরের কাছে বড় নদীতে মিশিয়াছে। খালের পূবপাড়ে গ্রামের যে অংশটুকু আছে তাহাতে ভদ্রলোকের বসতি নাই। গোয়ালাপাড়া, কুমোর-পাড়া, আর বাগ্দীপাড়া লইয়া খালের এ তীরের গ্রাম। কয়েকঘর দরিদ্র চাষা তাহার মধ্যে মাথা গুঁজিয়া আছে। খালের খানিক তফাতে প্রকাণ্ড একটা বিল। স্থানটা একটু জঙ্গলাকীর্ণ এবং অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

গোয়ালাপাড়ার শেষের দিকে, বিলের ধারের জঙ্গল ঘেঁষিয়া, পুরাতন বিবর্ণ খড়ে-ছাওয়া বাড়ীটি মধু ঘোষের। তক্তপোষে মলিন দুর্গন্ধ বিছানায় মধু ঘুমাইয়াছিল। কাল সবে তাহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। শরীরে এখনো সে ভাল করিয়া বল পায় নাই। বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া ছেঁড়া কাঁথাটা গায়ে জড়াইয়া সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। বেড়ার গায়ে বাঁশের কঞ্চি বসানো ক্ষুদ্র জানালাটি দিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বলিল, 'ছাখ্ কাদু, কপালখানা ছাখ্ একবার।'

কাদু আগেই উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়াছিল। বলিল, 'কপালের কি হ'ল ?'

মধু বিমর্ষভাবে বলিল, 'এখনো পথ্যি পেলাম না, আজ শালার জল নামল। দু'দিন পরে এ জলটা হলে একবার বেরোনো

যেত। ভাদ্দরের শেষ, এবছর আর জল হবে কি না ভগবান জানে!'

বর্ষার রাত্রে চুরি করিবার অনেক সুবিধা আছে। অমাবস্যার রাত্রির চেয়ে অন্ধকার গাঢ় হয়, ঠাণ্ডায় মানুষ গভীরভাবে ঘুমায়, শত প্রয়োজনেও সহজে কেহ পথে বাহির হয় না। গ্রামের কুকুরগুলি আশ্রয় খুঁজিয়া লইয়া মাথা গুঁজিয়া থাকে, সামান্য পদশব্দেই খাঁ খাঁ করিয়া ওঠে না। গৃহস্থের ঘরের ভিটা বৃষ্টির জলে নরম হইয়া থাকে। সিঁদ কাটা সহজ হইয়া পড়ে এবং শব্দ হয় কম।

মধুর সিঁদ কাটিবার বিশেষ দরকার ছিল। গত বৈশাখ মাসে রসুলপুরের মেলায় পুলিশের লাইসেন্স লইয়া বালা খেলার ব্যবস্থা করিয়া সে কিছু টাকা পাইয়াছিল। তারপর এপর্য্যন্ত তাহার আর কোন উপার্জ্জন হয় নাই। উপার্জ্জনের চেষ্টাও অবশ্য সে করে নাই। হাতের টাকা একেবারে শেষ না হইয়া গেলে রোজগারের দিকে মধু নজর দিতে পারে না। এমনিভাবেই সে এতকাল কাটাইয়াছে। এই তাহার স্বভাব। বছরের কয়েকটা মাস তাহার বেশ সুখেই কাটিয়া যায়। বাকী মাসগুলি অভাবের পীড়নে তাহার ও কাতুর কষ্টের সীমা থাকে না। একেবারে অচল হইয়া পড়ার আগে মধু সহসা আবার কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া ফেলে।

বৈধ উপায়ে আজ পর্য্যন্ত সে একটি পয়সাও উপার্জ্জন করেছে কি না সন্দেহ। গোপন ও প্রকাশ্য যতপ্রকার উপায়ে তাহার

অনিয়মিত আয় হয় তার সবগুলিই নীতিবিগর্হিত। কিন্তু কোন রকম নীতির ধার মধু ধারে না। পয়সার জন্য সে করিতে পারে না জগতে এমন কাজ নাই। সে শিশুর গলার হার ছিনাইয়া লইয়াছে, মেলায় জুয়াড়ী সাজিয়া দরিদ্র চাষার উপার্জ্জনে ভাগ বসাইয়াছে, পকেট মারিয়াছে, দূর গ্রামে গিয়া পিতৃদায় উদ্ধারের জন্য বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়াছে। কোমরে ল্যাঙ্গট আঁটিয়া সর্ব্বাঙ্গ তৈলাক্ত করিয়া মাঝে মাঝে গৃহস্থের ভিটায় সিঁদও সে দিয়াছে। দেহে শক্তি ও মনে সাহস থাকিলে বোধ হয় ডাকাতি করিতেও সে ছাড়িত না।

দুয়ারের কাছে প্রদীপটা নামাইয়া রাখিয়া ঝাঁপ খুলিতে খুলিতে কাদু তাহার কথার জবাবে বলিল, 'বেরিয়ে তো রাজা হয়ে আসতে। মজুর খাটলে মানুষ তোমার চেয়ে বেশী রোজগার করে।'

মধু আহত ও উষ্ণ হইয়া বলিল, 'কেন, রোজগারটা কম হচ্ছে কি শুনি? তোকে সেদিন রূপোর চুড়ি কিনে দিইনি?'

কাদু মুখ ফিরাইয়া বলিল 'ও, ভারি রূপোর চুড়ি দিয়েছ! চারবছর ঘর করছি, ক-গাছা রূপোর চুড়ি দিয়ে বাখানের আর সীমে নেই। চুলোয় গুঁজে দেব চুড়ি।'

ঝাঁপ খুলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। ঘুঁটের ঝুড়িটা বাহিরের রোয়াক হইতে ঘরের ভিতরে আনিয়া রাখিয়া বলিল, 'সাধ আহ্লাদ চুলোয় গেছে। ঘুঁটে দিয়ে ঝিগিরি করে মরলাম। দু-গাছা চুড়ি দিয়ে অত তোমার বড়াই কিসের? অন্য কেউ হলে কত দিত!'

মধু অবাক হইয়া গেল। কাদুর মুখে এই ধরণের নালিশ শুনিবার অভ্যাস তাহার ছিল না। নালিশ করিবার স্বভাব কাদুর

নয়। চার বছর আগে বৃন্দাবনপুরের যতীন সাহার বাড়ীতে সিঁদ দিয়া মধুর একটা মোটা রকম লাভ হইয়াছিল। মাসে দশ টাকা আর খাওয়াপরা দিলেই কুমোরপাড়ার সৌদামিনী তাহার সঙ্গে বাস করিতে তখন রাজী হইয়া যাইত, কিন্তু দুইশত টাকা পণ দিয়া কাদুকেই বিবাহ করিয়া সে ঘরে আনে। তিন চার বছর জেলে পচিবার বিপদ মাথায় করিয়া উপার্জ্জন করা অতগুলি টাকা দিয়া একদিনের জন্য মধু আপ্‌শোষ করে নাই। কাদুর রূপ ও গুণের তুলনায় ও-টাকা কিছুই নয়। হাতে টাকা থাকায় কাদুকে ঘরে আনিয়া বছর খানেক তাহার সুখেই কাটিয়া গিয়াছিল। এক বছরের মধ্যে উপার্জ্জনের জন্য মধু একেবারেই মাথা ঘামায় নাই। কাদুময় জগতে কাদুর নেশায় বিভোর হইয়া অলস অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করিয়াছিল। তারপর টাকার অভাবে প্রায়ই তাহারা কষ্ট পাইয়াছে। মাঝখানে মধুতো একবার জেলেই যাইতে বসিয়াছিল। সে সময় কাদুকে দু'এক বেলা উপবাস পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে; কিন্তু কাদু কখনো অনুযোগ করে নাই। আজ ক-দিন ধরিয়া তাহার কি হইয়াছে কে জানে।

ফুঁ দিয়া আলো নিবানোর সময় কাদুর আলোকোজ্জ্বল মুখখানি মধু একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, কাদুর মুখে একটা অপরিচিত ছায়া পড়িয়াছে। প্রদীপের শিখার কাছে মুখ আগাইয়া লইয়া গিয়া ফুঁ দেওয়ার আগে কাদু যে ভাবে আড়চোখে তাহার দিকে চাহিল সে ভঙ্গীও মধুর কাছে অচেনা ঠেকিল।

কাদু বিছানায় উঠিয়া আসিলে তাহাকে আদর করিবার

চেষ্টা করিয়া মধু বলিল,—'একবার বেরোই আজ কি বলিস্ কানু ?'

কানু রূঢ়ভাবে তাহার আদর প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল, 'তোমার খুসী। ঘুম পেয়েছে, জ্বালাতন কোরোনি বাবু, আমাকে ঘুমুতে দাও।'

মধু আহত হইয়া কাঁথাটা গায়ের উপর টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল। বাহিরে ঝম ঝম শব্দে বৃষ্টি হইতেছে। বর্ষার শেষ অভিনয়। চার পাঁচ দিন পরেই পূর্ণিমা। কাল হয়ত মেঘশূন্য আকাশে চাঁদ উঠিবে। জ্যোৎস্নায় রাত্রিতে চলাফেরার গোপনতা যাইবে মুছিয়া। মধুর মন কেমন করিতে লাগিল। আজ রাত্রির মত সুযোগ বহুকাল পাওয়া যাইবে না। কানুর মুখে আবার কবে সে হাসি ফুটাইতে পারিবে কে জানে। যত দিন যাইবে অভাব ততই বাড়িয়া চলিবে। কানুর ধৈর্য্য যখন একবার ভাঙিয়া গিয়াছে, রাগ এবং বিরক্তি তাহার অভাবের অনুপাতে বাড়িবে বই কমিবে না।

মধুর ঘুম আসিল না। শুইয়া শুইয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। কিছু দিন আগে সে খবর পাইয়াছিল, গ্রামের রাখাল মিত্র অনেকগুলি নগদ টাকা সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। রাখাল মিত্রের বাড়ীটা কাঁচা। রাখালের টাকা রাখিবার লোহার সিন্দুকও নাই। মধুর লোভ হইয়াছিল। রাখাল বাড়ী আসিলে রাখালের বৌ স্বামীসেবার সুবিধার জন্য একটা ঠিকা ঝি রাখে। ঘরের সন্ধান আনিবার জন্য অনেক বলিয়া কহিয়া কানুকে রাজি করিয়া মধু তাহাকে রাখালের বাড়ী কাজ করিতে পাঠাইয়াছিল।

বলিয়াছিল, 'একদিনের তরে যা কাদু। খবরটা এনে দে। একদিন কাজ ক'রে পোষালো না বলে চলে আসিস, আর তোকে যেতে হবে না।' কাদু বলিয়াছিল, 'হে ভগমান! শেষকালে ঝি গিরি পর্য্যন্ত অদেষ্টে ছেল!'

কোন্ ঘরের কোন্ দিকে রাখাল ঘুমায়, তার ছেলে পান্নালাল কোন্ ঘরে শোয়, রাখালের ঘবের কোথায় বাক্স প্যাঁটরা থাকে, এ সব খবর কাদু তাকে আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই হইতে নিজেও সে যেন কেমন বদলাইয়া গিয়াছে।

প্রথমটা মধু অত খেয়াল করে নাই। ভাবিযাছিল, ঝিব কাজ করিতে পাঠানোয় কাদুর বুঝি বাগ হইয়াছে, সে অভিমান করিয়াছে, এ আর ক-দিন স্থায়ী হইবে? কিন্তু আজ কাদুর সুস্পষ্ট কলহ-ভাষণ ও নিষ্ঠুর আচরণের পর তাহার পরিবর্ত্তনের ইতিহাস মধুর আগাগোড়া মনে পড়িতে লাগিল। ইহাকে সাময়িক ক্রোধ ও বিরক্তি মনে করিয়া স্বস্তি-লাভের সাহস তাহার আর রহিল না।

সবচেয়ে বেশী করিয়া মধুর মনে পড়িতে লাগিল এই কথা যে, কাদু জ্বরের ক-দিন ভাল করিয়া তাহার সেবা করে নাই, সময় মত খাইতে দেয় নাই, না ডাকিলে কাছে আসে নাই। সর্ব্বদা কি রকম অন্যমনস্ক থাকিয়াছে। একদিনের বেশী তাহার দাসীবৃত্তি করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু বিশেষ করিয়া বারণ করা সত্ত্বেও তাহাকে অসুস্থ রাখিয়া সে রাখালের বাড়ী কাজ করিতে চলিয়া গিয়াছে। কৈফিয়ৎ দিয়াছে, 'হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলে লোকে সন্দ' করবে যে!'

'সন্দ করবে না করবে আমি বুঝব। তুই আর বাসনে কাহু।'

'এ মাসের ক-টা দিন যাই। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ মানুষ কাজ ছেড়ে দেয় কি করে শুনি?'

এমনি সব কথা যার অর্থ বোঝা যায় না।

মাঝখানে একদিন রাখালের বড় ছেলে পান্নাবাবু আসিয়াছিল এক অদ্ভুত প্রস্তাব লইয়া।

'রাজু কাল শ্বশুরবাড়ী যাবে মধু। তোমার বৌকে সঙ্গে দিতে হবে। বেশীদিনের জন্য নয়,—ধর, এই দিন পনের।'

মধু রাজী হয় নাই।

কিন্তু রাখালের মেয়েব ঝি হইয়া তাহার শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার জন্য কাহুর উৎসাহ দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। যাওয়ার অনুমতি না পাইয়া দুদিন কাহু তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলে নাই।

'দশ টাকা মাইনে দিত। দশটা টাকা তোমার জন্যে জলে গেল।' বলিয়া বলিয়া কয়েকদিন সে যে কেন আপশোষ করিয়া মরিয়াছিল অনেক ভাবিয়াও মধু তাহা বুঝিতে পারে না।

* * * *

অনেকক্ষণ পরে মধু টের পাইল, পাশে কাহুর চোখেও ঘুম আসে নাই।

'ঘুমোসনি কাহু?'

'না।'

মধু আর একবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'কেন ঘুমোসনি রে ? এত ঘুমকাতুরে তুই।'

'গরম লাগছে। ছাড়ো।'

সারাদিনের গুমোট করা গরমের পর এতক্ষণে পৃথিবীর আবহাওয়ায় মনোরম শীতলতা ঘনাইয়া আসিয়াছে। কাদুর কথাটা মধু বিশ্বাস করিতে পারিল না।

'তোর কি হয়েছে বল্ত ?'

'কি আর হবে ? কিছু হয়নি। জ্বর থেকে উঠেছ, রাত না জেগে ঘুমোও না বাবু।'

এ অনুরোধ স্নেহের পরিচায়ক। কিন্তু কথাগুলিতে এমনি ঝাঁঝ ছিল যে মধু আবার আহত ও অবাক হইয়া গেল। কাদুর এই স্থায়ী অনমনীয় বিরক্তির কারণটা অনুমান করা অবধি তাহার মনের মধ্যে দারুণ অশান্তি হইতেছিল। বুনো শিয়ালের প্রকৃতি লইয়া ঈশ্বরের কোন্ বিস্ময়কর নিয়মে কাদুকে সে ভালবাসিয়াছিল বলা যায় না। আপনার বিকৃত গোপনতা, লোভ ও সেই লোভের জন্য বিরামহীন শাস্তির আশঙ্কা এবং মৃত বিবেককে বুকে করিয়া বেড়ানোর যন্ত্রণা তাহার মনের চারিদিকে হীনতার প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে। স্বার্থ ছাড়া জগতে সে আর কিছুই বোঝে না। তবু কাদুর প্রতি তাহার অপরিসীম মমতা আছে। যে মমতার বশে কাদুর জন্য তাহার অনেকগুলি ত্যাগ সম্ভব হইয়াছে। তাহার নিস্তেজ ভীরু মন তাহার চেয়ে যারা দুর্ব্বল তাহাদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে কাদুর সুন্দর ফাঁপা গাল দুটিতে চড় বসাইয়া দিবার জন্য মনে যে

তাহার কখনও উন্মত্ত ইচ্ছা জাগে নাই এমন নয়! কিন্তু জীবনে আর কোন বিষয়ে লেশমাত্র সংযম না থাকিলেও এ ইচ্ছাকে সে বরাবর দমন করিয়া আসিয়াছে।

রাগের সময় চোখ রাঙাইয়াছে, দাঁতে দাঁত ঘষিয়াছে, যা তা গাল দিয়া বসিয়াছে। কিন্তু কখনো গায়ে হাত তোলে নাই।

কাছুর চোখে জল দেখিবামাত্র নিজেও সে গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোকে যে ভাবে প্রগাঢ় আবেগের সঙ্গে, প্রেমাত্মক সুনিবিড় আত্মীয়তার সঙ্গে, ক্রন্দসী প্রিয়াকে আদর করে, তেমনিভাবে বুকে নিয়া চুমো খাইয়া গদ্‌গদ ভাষায় ভালবাসা জানাইয়া কাছুকে সে সোহাগ করিয়াছে। বলিয়াছে, 'তুই আমার পাঁজরা কাছু, তুই আমার চোখের মণি। আমার আঁধার ঘরের আলো তুই, মাণিক তুই,—মাইরি।' বলিয়াছে, 'এক লহমার জন্যে তোকে চোখের আড়াল করলে বুক ফেটে যায় কাছু।'

কাছু এ ভালবাসা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতে ছাড়ে নাই। মন দিয়া করিয়াছে স্নেহ, দেহ দিয়া করিয়াছে সেবা। চোরের মনটি চুরি করার জন্য যত কলা কৌশল ছল চাতুরী সম্ভব তাহার একটিকেও সে অবহেলা করে নাই। মধুর মনে হইয়াছে, জগতে কাছুর তুলনা নাই। রূপে গুণে স্নেহ-মমতায় সে অতুলনীয়া। অনেক তপস্যায় ওকে সে পাইয়াছে।

সেই কাছু কি আজ তাহার পর হইয়া গেল? সোনার চুড়ির বদলে রূপার চুড়ি দিয়াছে বলিয়া সোণার মেযে কি পাথর হইয়া গিয়াছে? তাহার চেয়ে টাকাকেই ভালবাসিতে শিখিয়াছে?

আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ শুইয়া থাকিবার পর মধু হঠাৎ উঠিয়া বসিল। বলিল, 'কাহু ওঠ্ তো একবার।'

কাহু বলিল, 'কেন, উঠব কি জন্যে ?'

'আলো জ্বাল্। বেরুবো।'

খানিকক্ষণ কাহুর উঠিবার লক্ষণ দেখা গেল না। মনে মনে সে কি ভাবিতে লাগিল কে জানে।

তারপর নিঃশব্দে উঠিয়া দীপ জ্বালিল।

বলিল, 'না বেরুলেই হ'ত আজ। জ্বর থেকে উঠেছ।'

মধুর হঠাৎ রাগ হইয়া গেল।

'অত সোহাগ তোকে আর জানাতে হবে না, জানলি ? ঢের হয়েছে। অন্যলোকে কত দিত! যে দিত, যা না তার কাছে।'

কাহুর হাতে নূতন চুড়িগুলিকে প্রদীপের আলোয় চিক চিক করিতে দেখিয়া মধুর রাগ একমুহূর্তে অভিমানে পরিণত হইয়া গেল।

'জ্বরগায়ে রাতদুপুরে বিষ্টি মাথায় করে কামাতে চললাম, মেয়ের মুখ তবু হাঁড়িপানা হযেই রইল। ধবা পড়িতো আচ্ছা হয়।'

কাহু বলিল, 'কে যেতে বলেছে ?'

তুই বলেছিস্, তুই! · চুপ থাক্ কাহু। রাগের সময় কথা কয়ে রাগ বাড়াস না।'

কাহু একটু ভয় পাইয়া বলিল, 'খামখা রাগ করলে মানুষ কি করবে ?'

মধু রাগে অভিমানে স্ত্রীর কথার কোন জবাব দিল না। কেন ও পায়ে ধরিতে পারে না ? গলা জড়াইয়া কাঁদিতে পারে না ?

বলিতে পারে না, অসুখ-শরীরে আজ তুমি যেও না গো, তে দু'টি পায়ে পড়ি, কথা শোন, লক্ষ্মী, নইলে আমি গলায় দড়ি দেব ?

মধু কোমরে ল্যাঙট আঁটিল। কোমরে যে এত ব্যথা ধরিয়া আছে শুইয়া থাকার সময় কে তাহা জানিত! ঘরের কোণায় ভূষি-রাখা জালার ভিতর হইতে সিঁদকাঠি বাহির করিয়া মধু বলিল, 'এ মরচে ধরে গেছে। খেয়াল করে একটু তেলও একদিন মাখিয়ে রাখতে পারিস নি ? শিলটা আনতো, একটু ঘষে নিয়ে যাই।'

কাদু বলিল, 'বিষ্টিতে মাটি নরম হয়ে আছে। ওতেই হবে।'

মধু বলিল, 'যেমন তেমন করে আমায় বিদেয় করতে পারলে বাঁচিস, না ? তোর এত টাকার খাঁকতি কবে থেকে হ'ল বল্ ত ?'

কাদু কথা কহিল না। শিলটা আনিযা দিয়া বিছানায় বসিয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

তাহার এই অপরিচিত ভঙ্গী মধুর একেবারেই ভাল লাগিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, 'তেল মাখব' তেল দে কাদু।'

কাদু বলিল, 'তেল নেই।'

'নেই ? নেই কেন ?'

'জানিনে বাবু অত। নেই তো আমি কি করব ? গড়িয়ে আনব ?'

মধু স্থির দৃষ্টিতে কাদুর দিকে চাহিয়া রহিল। কাদুর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা, একটা গোপন-করা চাঞ্চল্য এতক্ষণে সে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। সে নিজে পাকা চোর, চোরের ভাবভঙ্গী তাহার অজানা নয়। কাদুর চোখে মুখে চুরির উদ্দেশ্য

সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, 'তোর ভাবখানা কি বল্‌ত? ও-রকম করছিস কেন?'

কাদু থতমত খাইয়া বলিল, 'ভাবনা লাগছে। তোমার জন্ম ভাবনা লাগছে। বাড়ীর মানুষকে সজাগ দেখলে সিঁদ দিওনি বাবু, ফিবে এসো।'

তবু যাইতে বারণ করিবে না। প্রথম দিন এমনিভাবে ল্যাঙট পরিয়া সারাগায়ে তেল মাখিয়া বাহির হওয়ার সময় কাদু কেবল তাহার পায়ে ধরিতে বাকী রাখিয়াছিল। সে দিনের কথাটা ভাবিতে ভাবিতে মনের মধ্যে একটা ক্ষুব্ধ অসন্তোষ লইয়া মধু ঝাঁপ খুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কাদুর ও তাহার নিজের শরীরের উত্তাপে উষ্ণ শয্যা ছাড়িয়া আসিয়া বৃষ্টির প্রথম স্পর্শে মধুর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। একবার সে মনে করিল ফিরিয়া যায়; কিন্তু ফিরিয়া গেলে কাদু খুসী হইবে না স্মরণ করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া গোয়ালাপাড়ার ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া সে সাবধানে গ্রামেব দিকে আগাইযা চলিল।

বৃষ্টি ধরিয়া আসিলেও আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। জলসিক্ত শুষ্ক খড়ের ঘরগুলিব পাশ দিয়া চলিতে চলিতে মধুর অসন্তোষ বাড়িয়া গেল। সব চেয়ে ভাঙাচোরা ঘরটি দেখিয়া তার মনে হইল যে এ বাড়ীর বৌ সাতদিন উপবাস করিয়া থাকিলেও বোধ হয অসুস্থ স্বামীকে এই অন্ধকার বাদল-রাতে ঘরের বাহির হইতে দেয় না। ওই স্বামীটির ভাগ্যের সঙ্গে তার ভাগ্যের পার্থক্য অকারণ নয়। যত গরীব হোক, ও চোর নয়। সে চোর। তার

বৌ তাই নিজের সুখের জন্য তাকে বিপদের মুখে যাইতে দিতে দ্বিধা করে না। চোর-স্বামীকে অনায়াসে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ঘুমায়!

অল্পক্ষণের মধ্যেই মধু খালের ধারে পৌঁছিয়া গেল। বহুকাল পরে আজ সে আত্মগ্লানি অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের যে সংস্কার তাহার মরিয়া মরিয়া একেবারে নবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই যেন আবার আগের রূপ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে অস্বস্তি ও বিতৃষ্ণা ছড়াইয়া দিতে লাগিল। খালের ধারে ধারে খানিক দূরের পুলটার দিকে চলিতে চলিতে রত্নাকরের মত সহসা মধু অনুভব করিতে আরম্ভ করিল, এতকাল সে অতি ঘৃণ্য জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। অকথ্য কদর্য্য জীবন। পাপের তার সীমা নাই। নরকেও তাহার ঠাঁই হইবে না।

ভাবিয়া নিজেকে মধুর একান্ত অসহায় মনে হইতে লাগিল। একটা অভূতপূর্ব্ব হারাইয়া যাওয়ার অনুভূতির মধ্যে তাহার সহসা যেন ভয় করিতে লাগিল। সে আবার ভাবিল, থাক্, কাজ নাই চুরি করিয়া, ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। কিন্তু কাদুকে মনে করিয়া এবারও প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছাটা তাহাকে দমন করিয়া ফেলিতে হইল। কাদুর উপরে তাহার রাগ ও অভিমানের সীমা ছিল না। তবু এমন অবস্থাতেও সে ভুলিতে পারিতেছিল না যে কাদু তাহাকে দুর্লভ রূপ-যৌবন দিয়াছে, আজ না দিক্ এতকাল স্নেহও দিযাছে। সেই দাবীতে কাদু তাহার কাছে সুখ চায়। প্রার্থনাটা যত স্বার্থপরের মত হোক্, অসঙ্গত নয়, অনুচিত নয়। কাদুকে এসব তাহার দিতেই হইবে যে।

খানিক আগাইয়া কুমারপাড়ার ঘাট। ঘাটে চার পাঁচটি ছোট বড় নৌকা বাঁধা আছে। একটি নৌকার ছইয়ের মধ্যে এতরাত্রে আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া মধু একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এতরাত্রে খালে নৌকার মধ্যে আলো জ্বালিয়া বসিযা আছে কে ? বহুকাল ধরিয়া অন্ধকারে পথে বিপথে বিচরণ করিয়া মধুর সাপের ভয় ছিল না। ঘন কাশবনের মধ্যে উবু হইয়া বসিয়া দুই হাতে কাশ ফাঁক করিয়া করিয়া ঘাটের পাশে নৌকার খুব কাছেই সে একটু একটু করিয়া আগাইয়া গেল। ভাবিল, বিদেশী পাটের দালাল হয় তো কপাল ভাল।

রসুলপুর নদীর ঘাটে এমনি এক বর্ষার রাত্রে মধু একজন মুখচেনা পাটের দালালের নৌকা হইতে একবার একটি ক্যাশবাক্স সরাইয়াছিল। বাক্সে ছিল নগদ প্রায় সাতশ' টাকা। আজও ফাঁকতালে তেমনি একটা দাঁও মারা যাইবে ভাবিয়া মধু খুসী হইয়া উঠিল। ভাবিল, রাখালের ভিটায় হযত আজ আর তাকে সিঁদ কাটিতে হইবে না। ধরা পড়িলে রাখালের গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলেটার হাতে মার খাইয়া মরিবার ভয়ে থাকিয়া থাকিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যে শির শির উঠিবে না।

পান্নাবাবুকে মধু বড় ভয় করে।

জলের স্রোতে নৌকাটি পাশাপাশি তীরের দিকে ঘেঁষিয়া আসিবাছিল। কোমর-জলে নামিয়া ছইএর ফুটায চোখ দিয়া ভিতরে তাকাইতে মধুর আকাশকুসুম শূন্যে মিলাইয়া গেল। ভিতরে বিছানা পাতা আছে। মাথার কাছে আলো রাখিয়া

সেই বিছানায় চিৎ হইয়া শুইযা বই পড়িতেছে রাখালেরই বড় ছেলে পান্নাবাবু।

রাখালের বাড়ীতে চুরি করিতে বাহির হইয়া রাখালের ছেলেকেই খালেব নির্জ্জন ঘাটে নৌকার মধ্যে এত রাত্রে একাকী বই পড়িতে দেখিবে মধুর ইহার কল্পনাতীতই ছিল। নৌকার ধার ঘেঁষিযা জলের মধ্যে খানিকক্ষণ সে অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল।

তারপর তাহার মনে হইল ব্যাপারটা হয়ত খুব আশ্চর্য্যজনক নয। পান্নাবাবু কাল বোধ হয সহরে বাইবে, আকাশে মেঘের ঘটা দেখিযা সকাল সকাল খাওযা দাওয়া সারিযা নৌকায় আসিয়া শুইযা আছে। ভোররাত্রে মাঝিরা আসিয়া নৌকা খুলিবে।

কিন্তু রাখালের বাডীর কাছে মজুন্দার ঘাটে নৌকা না বাঁধিয়া এতদূর উজানে আসিয়া নৌকা রাখা হইয়াছে কেন, অনেক ভাবিয়াও মধু তাহার কারণটা অনুমান করিতে পারিল না। কিন্তু এক বিষযে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। রাখালের বাড়ীতে বুড়া রাখাল নিজে আর দুটি ছোট ছেলে ছাড়া পুরুষমানুষ আর কেহ নাই। তাহার আবির্ভাব প্রকাশ পাইয়া গোলমাল হইলেও সহজে তাহাকে কেহ আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

মধু আর এ তীরে উঠিল না। সাঁতরাইয়া খাল পার হইয়া গেল। তাহার মন এখন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। ভাগ্যের অনেক-গুলি যোগাযোগের হিসাব করিয়া তাহার ধারণা হইয়াছে আজ রাত্রে তাহার সাফল্য অনিবার্য। আজ চুরি করিতে বাহির হইবে বলিয়া কাল তাহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল। আকাশে

আজ তাহার চুরির সুবিধার জন্যই মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং পান্নাবাবুকে বাড়ী ছাড়িয়া নৌকায় আসিয়া শুইতে হইয়াছে। ভাগ্যের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া দৈহিক দুর্ব্বলতার ছুতায় সে অলস হইয়া ঘরে শুইয়া থাকিতে পারে বলিয়া তাহাকে বাহির করার জন্য কাদুর মেজাজটাও আজই গিয়াছে বিগড়াইয়া।

আজ হয়ত তাহার লাভেরই কপাল।

মধুর দু'চোখ লোভে চক চক করিয়া উঠিল। অন্ধকারেরই একটা গাঢ়তর অংশের মত নিঃশব্দপদে সে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। থাকিয়া থাকিয়া দমকা বাতাসে মধুর শীত করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু মনে তাহার আর কোন দুঃখ নাই। কাদুর কাছে ঘা খাইয়া ক্ষণকাল পূর্ব্বে সে একবার নরকযাত্রা করিয়াছিল, এখন সে আবার অনায়াসে স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছে। চুরি করার মধ্যে আর সে দোষের কিছু দেখিতে পাইল না। ভাবিল, কিসের পাপ? জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে। কেউ করে আইন বাঁচাইয়া, কেউ আইন ভাঙে। স্বাধীনতার মূলধন লইয়া এ ব্যবসায় নামিতে যাহাদের সাহস নাই, চুরিকে পাপ বলে শুধু তাহারাই। পারিলে তাহারাও চুরি করিত। চোরের চেয়েও তাহারা অধম। তাহারা ভীরু, কাপুরুষ।

মধু প্রচুর আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে লাগিল। উত্তেজিত লোভের মধ্যে চুরির সমর্থন তাহার কাছে প্রায় গৌরবময় হইয়া উঠিয়াছে। এমন জীবন আর নাই। কতকাল ধরিয়া কত কষ্টে বিদেশে টাকা উপার্জ্জন করিয়া রাখাল বাড়ী আসিয়াছে, রাজার খাজনা মিটাইবে, দেনা শোধ করিবে, জমি কিনিবে, মেয়ের বিবাহ

দিবে। একরাত্রে কয়েক মিনিটের মধ্যে ওই টাকার হস্তান্তর! মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জন করিবার সময় সাধু রাখাল কি কখনো ভাবিতেও পারিয়াছিল টাকাগুলি শেষ পর্য্যন্ত কাজে লাগিবে মধুর। সে তাহার কানুর মুখের হাসি উপভোগ করিবে বলিয়া খাটিয়া মরিয়াছে রাখাল, এ যেন কৌতুক, এ যেন তাহার বাহাদুরী। মধুর ঠোঁট ভাঙিয়া হাসি ফুটিল।

অনুতাপ ও আত্মপ্রসাদ, আজ রাত্রে মধুর মনের এই ক্ষণে ক্ষণে আকাশপাতাল দোল-খাওয়াটা বিস্ময়কর কিছু নয়। চোরের অভিজ্ঞতা অতুলনীয়, হৃদয়ের বিবর্ত্তন তাহাদের অসাধারণ।

অথচ চোরেরা জীবনে বড় একা। ওদের আপন কেহ নাই। কবির মত, ভাবুকের মত, নিজের মনের মধ্যে ওরা লুকাইয়া বাস করে। যে স্তরের অনুভূতিই ওদের থাক্, যে রুক্ষ শ্রীহীন সীমানার মধ্যেই ওদের কল্পনা সীমাবদ্ধ হোক্, ওদের অনুভূতি, ওদের কল্পনা ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র, পরিবর্ত্তনশীল। অনেক ভদ্রলোকের চেয়ে ওরা বেশী চিন্তা করে। জীবনের এমন অনেক সত্যের সন্ধান ওরা পায়, বহু শিক্ষিত সুমার্জ্জিত মনের দিগন্তে যাহার আভাস নাই। কবির নেশা নারী, চোরের নেশা চুরি। আসলে ও দুটো নেশাই মানসিক উর্ব্বরতা বিধানের পক্ষে সমান সারবান। সংসারে এমন লক্ষ লক্ষ সাধু আছে, যাহাদের লইয়া আমি গল্প লিখিতে পারি না। জীবনে তাহাদের গল্প নাই। প্রেমিকের মত, অন্যায় অসঙ্গত চুরি-করা প্রেমে ব্যুৎপন্ন প্রেমিকের মত, চোরের জীবন গল্পময়।

সিঁদের ফুটা দিয়া রাখালের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় মধুর হৃদয় তীব্র সতেজ উত্তেজনায় ভরপূর হইয়া গেল, তাহার

প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ সতর্কতায় সজাগ হইয়া রহিল। ঘরে আলো কমানো ছিল। খাটের উপর পাঁচ ছয় বছরের ছোট ছেলেটিকে নিয়া রাখাল শুইয়া আছে। রাখালের স্ত্রী ও বিবাহ-যোগ্যা মেয়েটির বিছানা হইয়াছে মেঝেতে। এদিকের অন্ধকার কোণে নিশ্বাস রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া মধু ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। নিস্তব্ধ ঘরে ঘুমন্ত মানুষের শান্ত আবহাওয়া। এর মধ্যে আসিযা দাঁড়ানোমাত্র মধুর উত্তেজনা আরও তীব্র, আরও উন্মাদনাকর হইয়া গিয়াছিল। বাহিরের অন্ধকার হইতে আসিয়া ঘরের মৃদু আলোতেও সে সমস্ত পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছিল। রাখালের মেয়েটির উপর চোখ পড়িতে তাহার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মেয়েটা অবিকল কাদুর মত ভঙ্গী করিয়া ঘুমাইয়া আছে। জগতে সব মেয়েই কি এমনিভাবে ঘুমায়?

কিন্তু কাদুর হাতে রূপার চুড়ি। মেয়েটা সোণার চুড়ি পরিয়াছে। কাদুর মত ও মোটাও নয়, এখনো দেহটি ওর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার সময় পায় নাই। ক্ষীণ কটিতটে দেহরেখা ওর ধনুকের মত বাঁকিয়া আছে। মুখখানা কচি। ফুলের মতন কোমল। কাদুর মুখের মত পাকিয়া যায় নাই। গায়ের রঙ গোধূলির মত মনোরম, প্রভাতের মত উজ্জ্বল।

এই মেয়ের বিবাহের জন্যই বিশেষ করিয়া রাখাল টাকা লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। কাদুকে তাহার টাকা দিয়া কিনিতে হইয়াছিল। টাকা দিয়া মেয়েকে রাখাল বিলাইয়া দিবে।

মধু নিজেই মাথা নাড়িল। এক মুহূর্তের জন্য তার মুখের ভাব বিষণ্ন ও করুণ দেখাইল। কামনা করিবার অধিকার জগতে

সকলেরই আছে। কোন অবস্থাতেই কেহ নিজেকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিতও করে না। রাখালের ঘুমন্ত মেয়েটার জন্য একটা প্রগাঢ় অস্থায়ী প্রেম অনুভব করিতে মধুর হৃদয় কোন বাধাই পাইল না। হৃদযের এই আকস্মিক আবেগসঞ্চার তাহার নূতন নয়। গহনার দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া এমনি আকস্মিক হৃদয়োচ্ছ্বাস সে অনুভব করিয়াছে। দোকানের সুরক্ষিত গহনাগুলিকে দুর্লভ জানিয়া সে যেমন ব্যথা পাইযাছে, আজ তাহার এই কলঙ্কিত নিশীথ-অভিযানেব উগ্র ভযকাতর উপলব্ধিগুলির মধ্যে আকাশের চাঁদের মত দুষ্প্রাপ্য শিথিলবসনা মেয়েটিব জন্য ক্ষণিকের নিবিড় ব্যর্থ প্রেমে তেমনি একটা বেদনা অনুভব করিল। তাহার সাধ হইল, মেয়েটিকে একবার সে স্পর্শ করে। পরম আগ্রহে কম্পিত ব্যাকুল বাহুতে কাতুর মত ওকে একবার সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পলাইযা যায়। টাকা দিয়া তাহার কাজ নাই।

স্বর্গচ্যুত অভিশপ্ত দেবতা হঠাৎ চোখ মে'লয়া অদূরে স্বর্গের ছবি দেখিলে যেমন করিযা অশান্ত ও বিচলিত হইয়া পড়ে, মধুর বিকৃত মন নিষ্পাপ সুন্দরী মেয়েটির একটু স্পর্শ লাভের জন্য তেমনি-ভাবে কাঁদিয়া উঠিল। মরুপথিকের সামনে এ যেন সরোবরের আবির্ভাব। মরীচিকার মত মিলাইয়া যাইবে জানিয়াই ঝাঁপ দেওয়ার সাধ যেন কমে না, বাড়িয়া যায়।

মধু জোরে নিশ্বাস ফেলিল। দেবমন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া অশান্ত আত্মার ধূপগন্ধী বায়ুকে নিশ্বাসে গ্রহণ করার মত শ্বাস টানিয়া লইয়া আপনার জলসিক্ত অর্দ্ধ উলঙ্গপ্রায় দেহের দিকে চাহিয়া তার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সে যে নরকে বাস করে, আজ পর্য্যন্ত সে যে এক মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি পায় নাই, একথা হঠাৎ আবার তাহার মনে পড়িয়াছে। তার নোংরা দুর্গন্ধ ঘর, স্থূলাঙ্গী টাকা-দিয়া-কেনা হীনচেতা স্ত্রী, তার লোভ ও ভয়ে ভরা একটানা অস্বাভাবিক জীবন। ভদ্রলোকে কি-ভাবে বাঁচে মধুর তাহা অজানা নয়। সৎ ধর্ম্মভীরু গৃহস্থের জীবনযাত্রাপ্রণালীর সঙ্গে তার পরিচয় আছে। তেমনি একটি ঘুমন্ত পরিবারকে চোখের সামনে রাখিয়া, একটি কিশলয়ের মত কোমল কিশোরীকে ভালবাসিয়া (কয়েকমুহূর্ত্ত পরে মধুর অনুভূতি একেবারে লোপ পাইবে, তবু ইহা ভালবাসাই) মনে মনে মধু নিজের জীবনের সঙ্গে সংসারে যারা চোর নয় তাদের জীবনের তুলনা করিল। হিংসায় ক্ষোভে হতাশায় সে জর্জ্জরিত হইয়া গেল। ভাবিল, ফিরিয়া যায়। কাজ নাই তাহার চুরি করিয়া।

ফিরিয়া গিয়া নতুন করিয়া জীবন আরম্ভ করে। সংযত সুন্দর পবিত্র জীবন। ঈশ্বরকে আর কি ভক্তি করা যায় না? কাদুকে শেখানো যায় না লোভ করিতে নাই, নোংরা থাকিতে নাই, অবাধ্য হইতে নাই, কলহ করিতে নাই? সোণার চুড়ির চেয়ে রূপার চুড়িতে সুখ বেশী একি কাদুকে বোঝানো যায় না? পরকালের কথা ভাবিয়া পরদ্রব্যে লোভ করা কি তাহারা দুইজনে বন্ধ করিতে পারে না? সে মজুর খাটিবে। গরু কিনিয়া দুধ বেচিবে। জমি কিনিয়া চাষ করিবে। না হয় গ্রামের মধ্যে মনোহারী দোকান দিবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলিয়া তাহারা মন্ত্র গ্রহণ করিবে। সকালে উঠিয়া দিনের দেবতাকে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জীবিকার্জ্জনের জন্য খাটিয়া সন্ধ্যার পর একাগ্রচিত্তে

তাহারা মালা জপ করিবে! আস্তে কথা কহিতে শিখিবে। দুঃখে বিচলিত হইবে না। হৃদয়ের শান্তিতে সকল অবস্থায় শান্ত হইয়া থাকিবে। কাদুর একটি ছেলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—কাদুরই অসাবধানতায। এবার ছেলে মেয়ে হইলে বাঁচিবে। তাহাদের লইয়া সুখে তাহারা ঘরসংসার করিবে।

এতকাল সে তো চুরি কবিয়াছে। চুরি করিয়া লাভ কোথায় ?

প্রত্যেক চোর মধ্যে মধ্যে নিজেকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তবু চুরি করিতে ছাড়ে না। চোর চুরি না করিয়া করিবে কি ? চুরি ছাড়া চোরের জীবনে আর সবই যে আকাশকুসুম।

মধুর এত অনুতাপ, রাখালের মেয়ের জন্য এত ভালবাসা, সৎ হওযাব এত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলাইয়া আসিল। রাখালের তোরঙ্গটি সিঁদের ফাঁক দিয়া একটু পরে চলিযা গেল বাহিরে। বেশী টাকা রাখিবার উপযুক্ত ওই একটি তোবঙ্গই রাখালের ছিল।

কিছু দূরে একটি আমবাগানে ঢুকিয়া মধু তোরঙ্গটি ভাঙ্গিল। রাখালের বোধ হয় টাকা রাখিবার থলি ছিল না, নোট আর টাকা-গুলি সে একটা বালিশের খোলে ভরিয়া বাক্সে রাখিয়াছিল। অনেকগুলি খুচরা টাকা থাকায় টাকার পুঁটুলিটি কম ভারি হয় নাই। হাতে করিয়া আনন্দে মধুর মন নাচিয়া উঠিল।

খাল পার হওয়ার সময় একবার তার মনে হইল, টাকার অভাবে রাখাল হয়ত মেয়েটার বিবাহ দিতে পারিবে না। কিন্তু কথাটা তাহার মনের মধ্যে একেবারেই আমল পাইল না।

রাখালের মেয়ের জন্য তাহার বুকে আর বিন্দুমাত্র প্রেমও অবশিষ্ট ছিল না। রাখালের মেয়েকে সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

মধু জানিত, কুমারপাড়ার ঘাটে পান্নাবাবুর নৌকা বাঁধা আছে। কিন্তু ঘাটের কাছে আসিয়া ইতিমধ্যে নৌকাটি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ভাবিল, এত রাত্রে নৌকা ছেড়ে পান্নাবাবু গেল কোথায়?

বাড়ী পৌঁছিয়া ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া মধু খুসী হইল। ভাবিল, কাদু তাহারই প্রতীক্ষায় দরজা খুলিয়া বসিয়া আছে।

'আমি এসেছি, কাদু। আলো জ্বাল।'

সে আসিয়াছে, কাদুকে সোণার চুড়ি দিবার ব্যবস্থা করিয়া, একবছর দেড়বছর আরামে দিন কাটানোর উপায় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কাদু কত খুসী হইবে।

কাদুর সাড়া না পাইয়া সে ঘুমাইয়া আছে মনে করিয়া মধুর আনন্দ একটু কমিল। নিজেই সে কাঠের বাক্সের উপরটা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দিয়াশলাই খুঁজিয়া প্রদীপ জ্বালিল। পর-মুহূর্তে দীপালোকে ঘরের শূন্যতা প্রকট হইয়া গেল।

দু'চোখে অপার বিস্ময় ও আশঙ্কা নিয়া মধু ঘরের শূন্যতাকে প্রত্যক্ষ করিল। এতরাত্রে মানুষের ঘর যে কি করিয়া এমনভাবে খালি হইয়া যায়, এ যেন হঠাৎ সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। বিছানায় কাদু নাই। দড়িতে কাদুর কাপড় দু'খানা নাই। বড় টিনের তোরঙ্গটির উপর বেতের ছোট ঝাঁপিটিও নাই। মধু সহসা

ব্যাকুলভাবে টিনের তোরঙ্গটি খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে কাদুর ক-খানা ভাল কাপড় ছিল, একটা পিতলের পানের ডিবায় সোণার মাকড়ি ছিল, আঙটি ছিল। সেগুলিও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

মধুর মনের উত্তেজিত আনন্দ সহসা নিঝুম হইয়া গেল। টাকা ও নোটে ভরা বালিশের খোলটি পায়ের কাছে মাটিতে পড়িয়াছিল। সেদিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইল আবার তাহার জ্বর আসিতেছে। সহসা মধু বীভৎস হাসি হাসিল। রাখালের ঘরের দিকে চলিবার সময় যে যুক্তি দিয়া নিজের চৌর্য্যবৃত্তিকে সে সমর্থন করিয়াছিল সেই কথাটি হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে। জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে।

মাটির সাকী

দেহে নাই কান্তি মনে নাই শান্তি।

গরীবের এ দুটি অভাব চিরদিনের।

কিন্তু চিরদিনের অভাবও স্বভাবে পরিণত হয় না, একদিন সহিয়া যায় এই মাত্র এবং তাহাতেও আপশোষ বড় কম নহে।

নিজের একটা অপ্রিয় অকথ্য রূপান্তরের আপশোষ।

ওমনিবাস ট্রেন, ছ'টা সতর মিনিটে ছাড়িয়া বজবজ যাইবে। ট্রেনটি এমনি সংক্ষিপ্ত যে মেয়েগাড়ীর বাহুল্য নাই। গাড়ী ছাড়িবার কয়েকমিনিট পূর্ব্বে উঠিয়া সুশ্রী মেয়েটি ঠিক সামনে শক্ত হইয়া বসিয়া আছে। মুখের দিকে চাহিবার ইচ্ছাও যেন হয় না। ভয় করে! মনে হয় ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে পাতলা ঠোঁটদুটি শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া উঠিবে, মসৃণ গাল ভাঙিয়া ব্রণের দাগে ভরিয়া যাইবে, ভাসা ভাসা চোখদুটি বুভুক্ষায় মুমূর্ষু পশুর চোখের মত পীড়িত ও সকাতর হইয়া উঠিবে, কপালে দেখা দিবে তেলমাখা চটচটে ঘাম! রূপ দেখিলে দু'চোখ কুরূপের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যায়! কি আতঙ্কেই মিনিটগুলি ভরিয়া উঠিল।

মাত্র দশ মিনিটের পথ, গাড়ী ষ্টেশনে দাঁড়াইল। লাইনের একদিকে সহরতলী বালীগঞ্জ, অপরদিকে গ্রাম কসবা। আভিজাত্যের ছাপ মারা পিচ বাঁধানো পথটি রেলের গেট পার হইয়াই গোবর আর কাদায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দু'পাশের দোকানগুলির গ্রাম্য মূর্ত্তির গায়ে সহুরে ভাবের তালি লাগানো—খালি গায়ে বুট-পরা মানুষের মত। কিন্তু এগুলির দিকে চাহিয়া নিত্যাই শঙ্করের মনে হয় যে এ রকম একটা দোকান দিতে পারিলেও বুঝি মন্দ হইত না।

ঘোষালপাড়া ছাড়াইলেই শঙ্করের বাড়ী। বাড়ীটি পাকাও বটে, দোতলাও বটে; কিন্তু যেমন পুরাতন তেমনি ক্ষুদ্র। পথ হইতে দোতলার খোলা ছাদে উঠিবার খোলা সিঁড়ি খানিকটা চোখে পড়ে, মনে হয় চূণবালির বাঁধনহীন কতকগুলি আলগা ইটে পা দিয়া এ বাড়ীর লোকের ঊর্দ্ধগতির প্রয়াস। স্থানটি কিন্তু বেশ ফাঁকা আর পরিষ্কার। বাড়ীর সামনে একটা পুকুর—ছোট কিন্তু জল পচা নয়। দক্ষিণে হাত পঞ্চাশেক মাঠের ব্যবধানে রায় বাহাদুর মহাদেব বোসের বাড়ী। রায় বাহাদুরের অনেক টাকা ছিল বলিয়া এখানে সস্তা জমি কিনিয়া বাড়ী করিযাছিলেন। রায় বাহাদুর এখন বাঁচিয়া নাই, ছেলে সুকান্ত বাপের টাকা ও বাড়ীর মালিক। বড় বড় ঘর তুলিয়া, দামী আসবাবে সাজাইয়া, ছবির ফ্রেমের মত চারিদিকে বাগান করিয়া এবং অন্যান্য বহুবিধ সংস্কারের দ্বারা সে বাড়ীটিকে বাসোপযোগী করিয়া নিয়াছে। বাগানের একটা যুবতী ও পুষ্পবতী বকুলিকার ছায়ায় বসিয়া নিত্য অপরাহ্ণে সে পত্নী হিমানীর সঙ্গে চা পান করে।

আপিস-ফেরত পুকুরপাড় ঘুরিয়া নিজের বাড়ীর দরজায় যাইবার সময়টুকু শঙ্কর ইহাদের দেখিতে থাকে। মৃদু হাসি ও কথার মাঝে মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার বিরাম, হ্রস্বপদ লোমশ কুকুরটিকে কাছে টানিয়া মাথা চাপড়ানো, আশে পাশে দুই চারিটা বকুলফুলের এলোমেলো বর্ষণ, শঙ্করের চোখে ইহা আর পুরানো হইল না। রোজই তার মনে হয় কলেজ-জীবনে পড়া কবিতাগুলির এক একটি বাছিয়া নিয়া উহারা যেন অভিনয় করে।

চেনা আছে, পরিচয় নাই। ও পক্ষে আগ্রহের অভাব এ

পক্ষে সঙ্কোচের বাধা। কল্পনাতীত উপভোগ্য জীবনটা উহারা কি ভাবে ভোগ করে জানিবার সকরুণ কৌতুহল নিয়া ভাঙা ঘরে শঙ্কর দিন কাটায়।

পয়সার টানাটানি, ছেলেমেয়ের কান্না, আর বিধুর ধুঁকিতে ধুঁকিতে রান্না করা, বাসন মাজার ফাঁকে ফাঁকে অদৃষ্টের নিন্দাবাদ।

ন'টা এগারর গাড়ীতে আপিসে গিয়া ছ'টা সতরর গাড়ীতে বাড়ী ফেরা।

জীবনের এত অধিক বৈচিত্র্য সহ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া আপশোষ করিয়া মরে।

আজ বকুলতলা খালি দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। সচরাচর ইহা ঘটে না। শেষ বেলায় বকুলতলায় আসিয়া বসার নেশা যে কত তীব্র দুর হইতেও সে যে তাহা জানে।

বাড়ী ঢুকিয়াই কারণটা বোঝা গেল। ছেলেমেয়ে তিন জন কাঁদ-কাঁদ মুখে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে, বিধু চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে চৌকীর মলিন বিছানায় এবং শিয়রের কাছে টুলে বসিয়া হিমানী তার মাথায় ডবল আইসব্যাগ চাপিয়া ধরিয়া আছে।

অবস্থাটা বুঝিতে একটু সময় নিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে?

হিমানী বলিল, জ্বর। অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন, এখনো জ্ঞান হয় নি। ছেলেদের চেঁচামেচি শুনে এসে দেখি মেঝেতে প'ড়ে আছেন।

ঘামে জামাটা ভিজিয়া গিয়াছিল কিন্তু হিমানীর সামনে খোলা চলে না—তলায় গেঞ্জি নাই। স্বামীর খালিগা'ও হিমানী কোনদিন

দেখে নাই বলিয়াই শঙ্করের বিশ্বাস। বোতামগুলি আলগা করিয়া দিয়া সে বলিল, আমার আপিস এত দূরে যে চেঁচিয়ে ওরা ম'রে গেলেও শুনতে পাই না।

এই বাহুল্য কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য অবশ্য বাহুল্য নয়, হিমানী চুপ করিয়া রহিল।

ছোট মেয়েটি বাবাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চোখের শাসনে তার কান্না থামাইয়া শঙ্কর বলিল, আজ এসে দেখছি অজ্ঞান, আর একদিন এসে হয় তো দেখব ম'রে গেছে!

শঙ্করের আশঙ্কা হাল্কা করিয়া দিবার কোন চেষ্টা না করিয়া হিমানী বলিল, এ সময় কোন আত্মীয়াকে এনে কাছে রাখা উচিত।

শঙ্করের সুর তৎক্ষণাৎ বদলাইয়া গেল।

এখনি? এই তো মোটে সাত মাস। এখন ভয় কিসের?

হিমানীর মুখের উপর দিয়া একটা কালো মেঘ ভাসিয়া গেল, কথা কহিল ক্লিষ্ট স্বরে, এ যে কি ভয়ানক সময় আপনি বুঝবেন না। যত সাবধান হওয়া যাক ভয় কমে না। সর্ব্বদা একজন মেয়ে মানুষ কাছে না থাকলে যে কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেতে পারে—

অন্ধকারে সাপের ঠাণ্ডা স্পর্শ পাওয়ার মত শিহরিয়া সে চুপ করিল। দেখা গেল মুখ তার ভারি বিবর্ণ হইয়াছে। তিনটি সন্তানের জননীর সম্বন্ধে অপুত্রবতীর আশঙ্কার পরিমাণটা শঙ্করের কাছে পরমাশ্চর্য্যের মত লাগিল। এ ভাবে হিসাব করিলে সকল অবস্থায় নরনারী-নির্ব্বিশেষে কতরকম সর্ব্বনাশই তো হইতে পারে, মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া আধঘণ্টার ভিতর তার পঞ্চত্বলাভও সৃষ্টিছাড়া

কিছু নয়, সেজন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকার কোন অর্থই যে হয় না! কিন্তু ইহার আতঙ্ক অত্যন্তই সুস্পষ্ট,—ঠাণ্ডায় ফ্যাকাসে আঙুলগুলি পর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মনে হয় বুকের ভিতর ধুক-ধুকানিরও সীমা নাই। শঙ্কর বলিল, আপনার শরীর আজ ভাল নেই মনে হ'চ্ছে।

জ্বরে অজ্ঞান স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়া সদ্যপরিচিতার শরীর একটু ভাল না থাকার জন্য দুর্ভাবনা ভাল শোনাইল না। মুখ তুলিয়া ম্লান হাসিয়া হিমানী বলিল, রোজ যেমন থাকি আজও তেমনি আছি। আমার কথা বাদ দিন। শরীর ভাল থেকেই বা কি হবে!—ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি এসেছিলেন, রক্ত নিয়ে গেছেন। ওষুদও লিখে দিয়েছেন, জ্ঞান হ'লে একদাগ খাওয়াতে হবে।

আমার জন্য কিছুই করার রাখেন নি দেখছি। ডাক্তারের ভিজিট?

লাগেনি। উনি আমাদের বন্ধু!

তবে পীড়াপীড়ি করব না। কিন্তু আপনার চা খাওয়ার সময় পার হ'য়ে গেছে, আপনি এবার ছুটি নিন।

হিমানী ব্যাকুল হইয়া বলিল, না, না, আমায় ওঁর কাছে থাকতে দিন। চা এখানেই দিয়ে যাবে।

লণ্ঠনটা নতুন—ধোঁয়া হয় না, কিন্তু কমানো রহিয়াছে বলিয়া আলো অনুজ্জ্বল। এই আলোতেই হিমানীর মুখখানা যেন স্পষ্টতর দেখাইতেছে। সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া শঙ্করের মনে হইল আপিস যাইবার সময় সে কি কল্পনাও করিতে পারিয়াছিল যে ফিরিয়া

আসিয়া গৃহে এমন দুর্ভাবনা ও এতবড় বিস্ময় সঞ্চিত থাকিতে দেখিবে! হিমানীর আজকার ব্যবহার অদ্ভুত। চার বছরের প্রতিবেশী ইহারা; কিন্তু গরীব প্রতিবেশীকে কবে কতটুকু আমল দিয়াছিল? সম্বৎসরে হিমানী ও বিধুর মধ্যে একটি বাক্যবিনিময়ও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আর আজ নিজে হইতে আসিয়া এমন সেবাই আরম্ভ করিয়া দিল যে প্রয়োজন শেষ হইলেও উঠিয়া যাইতে চায় না। টাইমপিসটায় দশটা বাজে। বেলা একটা হইতে একভাবে বিধুর শিয়রে বসিয়া আছে। তিনচারবার নিজে ডাকিতে আসিযা একরকম ধমক খাইয়াই সুকান্ত ফিরিয়া গিয়াছে। কেরাণীর কুশ্রী বধূব সেবার জন্য ধনীর তরুণী প্রিয়ার এ কি লোলুপতা! মহত্ব সন্দেহ নাই, উদারতারই পরিচয়, কিন্তু কী অস্বাভাবিক!

আধঘণ্টা পরে সুকান্ত আবার আসিল। কোন কথা না বলিযা গম্ভীর মুখে চুপ করিযা দাঁড়াইযা রহিল। অসীম কুণ্ঠার সঙ্গে শঙ্কর মিনতি করিয়া হিমানীকে বলিল, আর তো দরকার নেই, এবার আপনি যান। কতক্ষণ এভাবে ঠায় ব'সে থাকবেন?

অপ্রত্যাশিতভাবে এবার কিন্তু প্রতিবাদ আসিল সুকান্তর নিকট হইতে—থাক শঙ্করবাবু, কিছু বলবেন না, একেই সেবা করতে দিন।

অবাক হইয়া শঙ্কর বলিল, কিন্তু—

সুকান্ত মাথা নাড়িল কিন্তু নয। বাড়ী গিয়ে ছটফট করার চেয়ে এখানে শান্তিতে থাকা ভাল। আমার যদি একটু বসবার ব্যবস্থা ক'রে দেন ওর সেবা করাটা দেখতে পারি?

মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই শঙ্কর দেখিল, হিমানী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া আছে। সুকান্ত এক প্রকার দুর্ব্বোধ্য হাসি দিয়া সে দৃষ্টিকে নন্দিত করিল, তারপর ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

খাদ্য আসিয়াছিল সুকান্তর বাড়ী হইতে। ছেলেমেয়েরা খাইয়া ঘরের এককোণে ক্ষুদ্র বিছানায় জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শঙ্কর বিছানার পাশে মাটিতেই বসিল। বুকের ভিতর চাপবাঁধা দুর্ভাবনা, তবু হঠাৎ তার যেন হাসি পাইল। ঘরে আজ দুইজোড়া স্বামী-স্ত্রী জড়ো হইয়াছে; কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় কি অসীম পার্থক্য! শয্যায় পড়িয়া আছে চামড়া-ঢাকা একটা কঙ্কাল, বাসর-রাত্রিতেও যার ওষ্ঠে মধুর বদলে জুটিয়াছিল দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে পচা খাদ্যকণার দুর্গন্ধ, আজ সাত বছরের বেশী যে তার মনকে উপবাসী রাখিয়া দু'বেলা যোগাইয়াছে শুধু রাঁধা ভাত। তিনটি পেটমোটা শিশুর শিয়রে বসিয়া আছে একটা কলেপেষা জীবন্ত ইক্ষুদণ্ড, জীবনটা যার স্রষ্টা কবির সৃষ্টির খাতায় ভুলিয়া যাওয়া শাদা পৃষ্ঠা। আর রুগ্নার শিয়রে যে স্ত্রীটি বসিয়া আছে, যে স্বামিটি বসিয়া আছে তাহারই ছেঁড়া মাদুরে—রূপ-যৌবন অর্থ-সম্মান হাসি-উৎসবের কি সমারোহ উহাদের জীবনে! রাত্রি এগারটার সময়েও বিধুর জ্ঞান হইল না। কিছুক্ষণ হইতে হিমানী উসখুস করিতেছিল, হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া সুকান্তকে বলিল, ডাক্তার বাবুকে আর একবার নিয়ে এসো।

সুকান্ত নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হিমানী বলিল, দু'জন এনো, কনসাল্ট করবেন।

সুকান্তর মুখে বিস্ময়ের চিহ্নও নাই, শুধু অভিজ্ঞতা। সামান্য একটু মাথা নাড়িয়া এমনভাবে স্বীকৃতি জানাইল যেন দু'জন ডাক্তার আনিবার কথা সেও ভাবিতেছিল।

প্রতিবাদের ইচ্ছা শঙ্করের মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু কিসের প্রতিবাদ করিবে? ইহাদের ভাব দেখিয়া একথা তো কল্পনাও করা যায় না যে, কলিকাতার সমস্ত ডাক্তার আনিয়া বিধুর চিকিৎসা করার চেয়ে বড় কর্ত্তব্য ইহাদের আর কিছু আছে!

টর্চ্চ জ্বালিয়া সুকান্ত চলিয়া গেল। পাড়াটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—সেও যেন আজ অসুস্থ এবং ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোর উপর তার শুশ্রূষার ভার। জানালার বাহিরেই চাঁদ ওঠার ইঙ্গিত, রোয়াকে বিধুর হাতে মাজা পিতলের ঘটিটা চকচক করিতেছে। বিধুর পায়ের আঙ্গুলে রেড়ির তেলে ভেজা ন্যাকড়া জড়ানো, হঠাৎ শঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিল। আজ দুর্ভাবনা—অতন্দ্র নিশায় আলো নিবাইলে ওই পায়ে যদি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ে?

হিমানীর পা' দুটি চৌকীর তলের আবছা অন্ধকারে। জরি-বসানো চটির দু'একটা জরি শুধু চিক-চিক করিতেছে। পা' দুটি যেন অন্ধকারে মোড়া সোনা, কয়েকটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া পরিচয় মিলিতেছে। ওই পায়ের গোড়ালি কি ফাটা? আঙ্গুলের চিপায় কি জলে ক্ষয় পাওয়া শাদা ঘা?

শঙ্করের মনে হইল হিমানীর পা' দুটি চৌকীর তলা হইতে টানিয়া আনিয়া এই একান্ত অসম্ভব সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া না নিলে চিরদিন তার মন কেমন করিবে।

চোখদুটা জ্বালা করিতেছে দেখিয়া শঙ্করের কৌতুক বোধ

হইল। থাকিবার মধ্যে চোখে আছে একটু ক্ষীণ দৃষ্টি—সে চোখ আবার জ্বালা করে!

আপনি খাবেন না? খেয়ে নিন। ভেবে আর কি করবেন!

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল হিমানী মুখের দিকে চাহিয়া আছে। স্ত্রীর অসুখের কথা ভাবিতেছিল না বলিয়া তার একবিন্দু লজ্জা হইল না। বলিল, আজ খাব না।

আপনি না খেলে এঁর কোন উপকার হবে না।

আমার অপকার হবে। অম্বলে বুক জ্ব'লে যাচ্ছে।

সকলেরি দেখছি সমান অবস্থা। আমারও অম্বল হ'লে বুক জ্ব'লে যায়।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে শঙ্কর কুঁজা হইয়া গিয়াছিল, অকস্মাৎ সোজা হইয়া বলিল।

আপনার অম্বল!

হিমানী ম্লান হাসিল, আর কলিক। যে দিন ধরে মনে হয় ব্যথায় বুঝি দম আটকাবে। মাগো, সে যে আমার কি কষ্ট!

শঙ্কর আবার কুঁজা হইয়া গেল—বিশেষভাবে হতাশ হইলেই তার মেরুদণ্ডটা ধনুকের মত বাঁকিয়া যায়।

হিমানী একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু ওজন্ত আমার নালিশ নেই।

কলিকের ব্যথা থাকার জন্ত আবার নালিশ কি থাকিতে পারে শঙ্কর বুঝিতে পারিল না, বলিল, কেন?

হিমানী নতমুখে অস্বাভাবিক গলায় বলিল, শুনলে আপনি লজ্জা পাবেন, ও যে আমার প্রাপ্য। প্রত্যেকটি মেয়ের জন্ত ভগবান

নির্দ্দিষ্ট ব্যথা মেপে রাখেন, মাথা পেতে নিজের ভাগ নিতেই হবে। ব্যথার এক রূপ এড়িয়ে গেলে অন্যরূপে দেখা দেবেই।

কি অদ্ভুত মন্তব্য! সঙ্কোচে নয়, মন্তব্যের ভারে শঙ্কর মাথা হেঁট করিল। কথাগুলি যেন একবোঝা অভিযোগ—একটি সুদীর্ঘ জীবনের ব্যর্থতার মত অসম্ভব ভারি!

কিন্তু শয্যাশায়িনী ওই সংক্ষিপ্তা মানবীটির অভিযোগও তো নিখিল মানবতার ইতিকথায় প্রক্ষিপ্ত নয়! ওর বুকের প্রত্যেকটি দৃশ্যমান পাঁজরা, ওর কালিপড়া চোখের অত্যধিক স্নেহের কালো ছানি, ওর জীবন যাত্রার অধিকারীর অন্তহীন বঞ্চনার তবে মানে কি! ভগবানের মাপিয়া রাখা ব্যথার ভাগের সঙ্গে মানুষের গুঁজিয়া দেওয়া ব্যথায় ওর শিরায় রক্তের রঙও বুঝি ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে।

হিমানীর কথাটা সে বুঝিল, না বোঝার মত করিয়া। ও নিত্য অপরাহ্নে বকুলতলায় স্বামীর সঙ্গে চা পান করিতে পায়। ভোর বেলা মোটরে চাপিয়া লোকালয় ছাড়িয়া গিয়া খোলা মাঠের মাঝখানে নির্জ্জন পথপ্রান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করে। লক্ষ ছাপানো মনের সঙ্গে নিত্য ওর ঘনিষ্ঠতা জন্মে,—আঙুলের সোনার কাঠি দিয়া সেতারের ঘুমন্ত রাগরাগিণীরও ঘুম ভাঙায়। গন্ধতেলে খোঁপা বাঁধে, সাবান মাখিয়া স্নান করে, ঘরে পরিয়া বেনারসী ছিঁড়িয়া ফেলে।

বিধুর কি আছে?

সহানুভূতির অভাব ছিল না কিন্তু; হিসাবে হিমানীর হার হইল।

সুকান্ত ডাক্তার নিয়া ফিরিবার পূর্ব্বে বিধুর জ্ঞান হইল।

রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়াই সকলকে চমকাইয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। হিমানীর হাত হইতে তুইটা আইসব্যাগই খসিয়া পড়িল। ছোট খোকা ঘুম ভাঙিয়া করুণ সুরে কাঁদিতে লাগিল। শঙ্কর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিধুর আর্ত্তনাদের শব্দার্থ এই :

মাগো এ ডাইনী কে! খোকা! ওরে খোকা!

বার কয়েক গলা চিরিয়া খোকাকে ডাকিয়া সে দিব্য সুর করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল, খোকারে···

হিমানী আইসব্যাগ তুটি তুলিয়া আবার মাথায় চাপিয়া ধরিল। খানিক পরে শ্রান্ত হইয়া বিধু বোধ হয় ঘুমাইয়াই পড়িল।

হিমানী জিজ্ঞাসা করিল, খোকা কোন্‌টি?

নেই।

নেই!

নাঃ। ওর মনে থাকতে পারে, পৃথিবীতে নেই। জ্যোৎস্না-রাতে খোকা একদিন ছাদ থেকে পাকা উঠানে প'ড়ে গিয়েছিল।

হিমানী চমকিয়া বলিল, সত্যি?

হ্যাঁ। জ্যোৎস্না উঠলেই খোকাকে নিয়ে ও ছাতে উঠত কেন কে জানে! রান্নার ফাঁকে ফাঁকে কতবার যে ছুটে যেত ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলত, জ্যোৎস্না দেখতে ভাল লাগে।

ও কথা সত্যি নয়।—হিমানীর কণ্ঠে কাতরতা।

তা ঠিক। জ্যোৎস্না দেখে ওর ভাল লাগা অসম্ভব। কিন্তু কেন যে উঠত ভেবে পাই না।

মুখ আড়ালে রাখিয়া হিমানী নীরব হইয়া রহিল। তেল কমিয়া গিয়াছিল, বার কয়েক দপদপ করিয়া আলোটা নিবিতে আরম্ভ করিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শঙ্কর যখন তেলের বোতলটা নিয়া আসিল আলো প্রায় নাই। দেখা গেল জ্যোৎস্না আসিয়া সত্যই বিধুর পায়ের কাছে বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিধু কিন্তু পা গুটাইয়া নিয়াছিল।

তেল ভরিবার চেষ্টায় আলোটা একেবারে নিবিয়া গেল। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে হিমানী বলিল, কতদিন আগে শঙ্কর বাবু?

কিসের?

কতদিন আগে খোকা ছাত থেকে—?

আলো জ্বালিবার চেষ্টা করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, পাঁচ ছ'মাস হ'ল বৈকি।—চৈত্রের প্রথমে।

কান্না শুনিনি তো!

শঙ্কর মাথা নাড়িল, ও এখানে কাঁদেনি। খোকার সঙ্গে হাঁসপাতালে গিয়েছিল, সেখান থেকেই ওকে ওর মা'র কাছে রেখে এসেছিলাম।—লণ্ঠনটা কেরাসিন কাঠের ভাঙ্গা টেবিলে বসাইয়া দিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিয়া গম্ভীর গলায় বলিল, কি জানেন, মড়াকান্না আমার একেবারে সহ্য হয় না।—মাথা ঘোরে।

যেন সে ছাড়া জগতের আর সব মানুষের মড়াকান্না সহ্য হয়, যে কাঁদে তারও! মানুষ যে কাঁচা মাটির পাত্র, একবার ভাঙ্গিলে চোখের জলে গুলিয়া আবার গড়া যায় একথা সে যেন জানে না। যেন একান্ত অনভিজ্ঞ শিশুটি!

হিমানী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মড়াকান্না সত্যি বড় বিশ্রী।

কিন্তু কাঁদতে না পারলে আরও বিশ্রী হয়। আমার ছোট ভাইটি যখন ম'রে যায় আমি কাঁদতে পারিনি।

শঙ্কর বলিল, কেন ?

কি জানি। নিজের হাতে মানুষ করেছিলাম ব'লে বোধ হয়। ছ'মাসের ভাইকে সাতবছরের করেছিলাম, সে মরলে কি কেউ কাঁদতে পারে ?

শঙ্কর নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল—পারে না।

হিমানী যেন তাহাতে খুসী হইল না, ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, অন্ততঃ পারা উচিত নয়। ও-রকম ভাইএর সঙ্গে পেটের ছেলের কি তফাৎ আছে ! মরলে অজ্ঞান হ'তে হয়, কাঁদতে নেই।

বলিয়া সে নিজের মনে বার কয়েক শিরশ্চালনা করিল। আবোল তাবোল মন্তব্যগুলির মধ্যে ইহা কোন্‌টির প্রতি সংশয়ের প্রতীক বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি এবং কলিকাতার আর একজন নামকরা ডাক্তারকে নিয়া সুকান্ত ফিরিল। চ্যাটার্জ্জি রক্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন ; বলিলেন, রক্তে মেলিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণুর অন্ত নাই। অন্যজন বিনা বাক্যব্যয়ে ইঞ্জেকসনের পিচকারীতে কুইনাইন ভরিলেন।

শঙ্কর বলিল, হাড়ে লেগে ছুঁচটা যেন না ভাঙ্গে ডাক্তারবাবু !

এই মন্তব্যে ঘরের আবহাওয়াটা অকস্মাৎ বীভৎস রকমের করুণ হইয়া উঠিল।

ডাক্তার বিদায় নেওয়ার খানিক পরে হিমানী শান্তভাবে স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিতে যতটা সময় লাগিল তাহাতে বোঝা গেল বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল।

একটা কথা বলতে এলাম, বলিয়া ভূমিকা করিল।

কি কথা বলুন।

পাঁচ ছ'মাস আগে জ্যোৎস্না উঠলে আমরাও ছাতে উঠতাম। খোকার মৃত্যুর জন্ম আমাদের কি পাপ হয়নি?

শঙ্কর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আপনাদের কেন পাপ হবে?

হিমানীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, বলিল, হয়েছে। আমি সত্যি ডাইনী। না জন্মাতেই আমার সব খোকাকে আমি মেরেছি, কারো খোকা মরলে আমি ছাড়া আর কার পাপ হবে? জানেন জ্যোৎস্নায় নামতে আজ আমার গা ছমছম করছে। আপনার সেই খোকা যদি আঁচল ধ'রে টানে?

টানিলে শঙ্কর কি করিবে? পিতা বলিয়া এখন কি আর সে তার কথা শুনিতে চাহিবে!

হিমানী বলিল, আমার সঙ্গে একটু আসবেন?

সুকান্ত নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মৃদুস্বরে বলিল, ভয় কি, এসো।

সকালে সুকান্ত খবর নিতে আসিল বিধু কেমন আছে। চেহারা দেখিয়া সে যে সমস্তরাত্রি ঘুমায় নাই বুঝিতে কষ্ট হয় না। শঙ্কর টুলটা আগাইয়া দিয়া বলিল, বসুন।

দাঁড়ান, খবরটা দিয়ে আসি আগে ; বলিয়া সুকান্ত চলিয়া গেল। পাঁচমিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বিনা আহ্বানেই টুলটাতে বসিয়া পড়িল।

সকাল বেলার আলোতে রাত্রির আলোর ইঙ্গিতটুকুও নাই, এবং তাহা নিঃসন্দেহ পরম আশ্চর্য্যের ব্যাপার। তথাপি বিধুর পায়ের আঙ্গুলে জড়ানো রেড়ির তেলের ন্যাকড়াটা শঙ্কর কখন যেন খুলিয়া নিয়াছে।

সুকান্ত বলিল, বুঝলেন শঙ্করবাবু, জীবনে একফোঁটা সুখ নেই।

একথা সকলেই জানে, শঙ্কর কিছু বলিল না।

আপনার এখান থেকে গিয়ে কি চেঁচামেচি আর কান্না যে আরম্ভ ক'রে দিলে যদি দেখতেন। কোন অভাব নেই তবু কেন যে ওর মাথা এমনভাবে খারাপ হ'য়ে গেল!

অভাবের প্রাচুর্য্যে আধমরা স্ত্রীর দিকে চাহিয়া শঙ্কর এবারও কিছু বলিতে পারিল না।

যাত্রা

বৈশাখের সপ্তমী তিথিতেই এ বাড়ীতে আজ বিজয়া আসিয়াছে।

চারিদিকে বিচ্ছেদ-বেদনার একটি করুণ ছায়াপাত হইয়াছে। কারণটা সম্ভবতঃ এই যে, সকলেই অল্পাধিক শ্রান্ত।

অথচ উৎসবের জের এখনও মেটে নাই।

বাড়ী এখনও আত্মীয়-স্বজনে ভরিয়া আছে, ছেলেমেয়েদের কলরব কালকের চেয়ে আজ কোন অংশেই কম নয়। অকেজো লোকের অকারণ চলাফেরা, কাজের লোকের অসহিষ্ণু ব্যস্ততা, খাওয়া, খাওয়ানো, মাছ কোটা, তরকারী কোটা, হলুদ বাটা ও রান্নার সমারোহ সবই পূরাদমে চলিতেছে। উঠানের কোণে নিম আর আম গাছের মেশানো ছায়ায় পাতা চৌকিতে বয়স্ক প্রতিবেশীদের হুঁকা টানার বিরাম নাই। তা, ইহা স্বাভাবিক বই কি। এতগুলি মানুষের মধ্যে ধরিতে গেলে কয়জনেরই বা বুকের ভিতরটা আজ ভারি হইয়া উঠিয়াছে, চোখের আড়ালে অশ্রু জমিয়াছে? দৈনন্দিন জীবনটা নিরুৎসব সকলেরই, সে জীবন পিছনে ফেলিয়া উৎসবের নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছে আজ যাহারা, দাবি তাহাদের আনন্দ আর বৈচিত্র্য, বরকনে-বিদায় ব্যাপারটা তাহাদের কাছে বিদায়-উৎসব ভিন্ন আর কিছুই নয়, মা ও মেয়ের কান্নাকাটি তাহারই আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান মাত্র।

তবু বেশ বুঝিতে পারা যায়,সমস্ত বাড়ীটাই কেমন যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছে ; আছে সবই কেমন যেন বেমানান হইয়া আছে।

খানিক আগে কুড়াইয়া পাওয়া মালকোষকে ঠিকমত আয়ত্ত করিতে না পারিয়া শানাই এখন, এই বেলা এগারটার সময়, সহসা

পূরবী ধরিয়া ফেলিয়াছে ; অনাবশ্যক দীর্ঘ টানগুলির মধ্যে পূরবীত্ব কিছু কম থাকিলেও বিলাপ আছে প্রচুর। সদর দরজার দুইপাশে কলাগাছ দু'টি পাতা এলাইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, একটি মঙ্গল কলসের আম্রপল্লব কাল বোধ হয় ছাগলেই অর্দ্ধেক খাইয়া ফেলিয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত তাহা বদলাইয়া দেওয়া হয় নাই। আর হইবেও না। আর আধঘণ্টা পরে বাড়ীর দুয়ারে মঙ্গল কলসেরই বা কি প্রয়োজন, তাহাতে অক্ষত আম্রপল্লব না থাকিলেই বা কি আসিয়া যাইবে!

ক্ষেন্তিই বিশেষ বন্ধু। ছেলে কোলে সকাল হইতে সে ইন্দুর কাছে থাকিয়াছে, নানা গল্প করিয়াছে, আশ্বাস, উপদেশ, সান্ত্বনা, নিজের প্রথম স্বামিগৃহে যাওয়ার বিশদ বর্ণনা, বলিতে কিছুই বাকী রাখে নাই। তবু যেন কথা ফুরাইতেছিল না।

না ফুরাইবার কথা।

নেপথ্যে ভবিষ্যতের ব্যথা জমিয়াছে। আবার কবে দেখা হইবে কে জানে? এক সময় দু'জনে বাপের বাড়ী আসিতে পারে তবেই ত। ক্ষেন্তির ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে, আর দিন তিনেক, তারপর বছর খানেকের মত নিশ্চিন্ত।

নিজের কথার সূত্র ধরিয়া ক্ষেন্তি বলিয়া চলিল—

'নিজেকে দু'ভাগ করে ফেলতে হবে ভাই, একভাগ শাশুড়ী ননদ দেওর এদের জন্য, আর একভাগ বরের জন্য। যদি দেখিস শাশুড়ী ননদ একটু বেশী বেশী শত্তুর ভাবছে প্রথম প্রথম, বরের ভাগটা ছোট করে ওদের ভাগটা বড় করে ফেলবি। তোর বরকে ভালই মনে হ'ল, অল্পেই তুষ্ট থাকবে।'

ইন্দু সলজ্জে একটু হাসিল। ভাল, না ছাই! কি লজ্জাতেই ফেলিয়াছিল কাল? আড়িপাতার ব্যাপার জানে না কোন দেশের মানুষ ও?

ক্ষেন্তি বলিল, 'হাসিস্ কি লো? ও-বাড়ীর পুষি বেড়ালটার পর্য্যন্ত যখন মন যুগিয়ে চলতে হবে তখন টের পাবি। এবার অবশ্য তেমন ভাবনা নেই, যে কটা দিন থাকিস্ বয়েস আর রূপের সমালোচনা শুনে আর যে যা ক'রতে বলে ক'রে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসবি। ঠ্যালা বুঝবি পরের বার। কেউ আপন করবার চেষ্টাটুকুও করবে না,—এক বর ছাড়া, তা বরও যে খুব বেশী চেষ্টা করবে মনেও করিস্ না,—নিজে নিজে তোকে সকলের আপন হতে হবে। বাব্বা, সে এক তপস্যা। লোক যদি ওরা মোটামুটি ভাল হয় তা হলে বছর খানেকের তপস্যাতেই এক রকম ঠিক হয়ে আসে, পান থেকে খসা চূণটুকু নিয়ে আর কেলেঙ্কারী কাণ্ড বেধে যায় না, গরম মেজাজী কেউ থাকলেই চিত্তির! একটা ফ্যাকড়া যদি বাধে, আর কি, রইল তা চিরস্থায়ী হয়ে, দোষ সে তোমারই হোক আর যারই হোক! আমার মেজ ননদ? কি রাগ বাবা, তাওয়ার মত তেতেই আছে! আমাকে গাল না দিয়ে আজও কি সে জল খায়? খায় না! শাশুড়ী মাগী লোক মন্দ নয় তাই রক্ষা, নইলে গিয়েছিলাম আর কি!' মেজ ননদের সঙ্গে কবে কি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া খুঁটিনাটি বাধিয়াছিল, ক্ষেন্তি তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দাখিল করিল; শেষে বলিল, 'তা শোন্, পরের বার যখন যাবি একটা কথা মনে রাখিস যে, ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত যত মুখ বুজে খাটবি সবাই তত ভাল বলবে, আর

রাত জেগে বরের সঙ্গে যত গুজগাজ্ ফিস্‌ফাস্ কয়তে পারবি বর তত খুশী থাকবে।' বলিয়া ক্ষেন্তি হাসিল।

ইন্দু মৃদুস্বরে বলিল, 'শেষেরটাতেই ভয় ভাই। যে ঘুমকাতুরে আমি জানিস্ ত।'

'ঘুম আর চোখে থাকবে না লো, থাকবে না, বরঞ্চ মনে হবে, পোড়া বিধাতার কি বিবেচনা মরে যাই, এত ছোট করেছে রাত, তার উপর আবার ঘুমের ব্যবস্থা!'

ঘটনার ঘনঘটায় ইন্দুর মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, সখীর পরিহাসে সে অল্প একটু হাসিল বটে, কিন্তু কৌতুক অনুভব করিল আরও কম। হরেন (ইন্দুর বরের নাম; মানুষটার চেয়ে নামটির সঙ্গেই ইন্দুর পরিচয় বেশী দিনের; নাম ও নামীকে সে এখনও একত্র জড়াইয়া ভাবে) অনেকক্ষণ খাইতে বসিয়াছে, নতুন জামাইয়ের খাইতে সময় লাগে, কিন্তু সে আর কতকক্ষণ, হরেনের খাওয়া হইলেই যাত্রা।

অজানা অচেনা মানুষের সঙ্গে সেই তালশিমূলীর উদ্দেশে যাত্রা, সেখানে যাইতে হইলে তের মাইল পাল্কীতে গিয়া ষ্টীমার ধরিতে হয়; রাত দশটায় সে ষ্টীমার কোন্ ষ্টীমার ঘাটে নামাইয়া দেয় কে জানে, তারপর রাত বারোটা অবধি পাড়ি জমাইতে হয় নৌকায়। মালপডি হইতে তালশিমূলী অনেকদূর—এতই দূর যে ব্যবধানটা ইন্দুর মনে দিকহীন রাইঘোষাণীর মাঠের মত ধূ ধূ করিতে থাকে, —বৈশাখের খররৌদ্রে যে মাঠের তৃণগুলি ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে, এখন যাহার দিকে তাকাইলে আগুনের হল্‌কায় দু'চোখ টন টন করিবে।

রাইঘোষাণীর মাঠ ঘেঁষিয়া হাঁদার ঘাটের পথটা অনেক দূর অবধি সিধা চলিয়া গিয়াছে, তারপর ডাইনে বাঁকিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে সাতগাঁয়ে। ওই গ্রামে স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী। স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর ছেলের সঙ্গে ইন্দুর সম্বন্ধ হইতেছিল, কেন ভাঙিয়া গেল কে জানে! ওখানে বিবাহ হইলে একদিক দিয়া ভালই হইত ইন্দুর। যখন তখন সে বাপের বাড়ী আসিতে পারিত, সোমবারে বিষ্যুদ্‌বারে বাবা আর দাদা মালসিপুকুরের হাটে যাইবার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতে পারিত, স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর পিছনের ধান ক্ষেতটা পার হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলে মালপতির গাছপালা তাহার চোখে পড়িত; সবচেয়ে উঁচু তাল গাছটার নীচেই তাহাদের এই বাড়ী। ছেলে কালো তো কি হইযাছে? বরের রঙ্ ধুইয়া সে কি জল খাইত?

তা ছাড়া, স্বরূপ চক্রবর্ত্তী আর তাহার ছেলে দুজনেই তাকে বউ করিবার জন্য কি রকম ব্যগ্র হইয়াছিল? চক্রবর্ত্তী-গিন্নিকেও সে দেখিয়াছে, ভারি শান্ত অমায়িক মানুষ। ওখানে বিবাহ হইলে শ্বশুরবাড়ীর আদর জুটিবে কি অনাদর জুটিবে এই নিয়া ইন্দুকে আর এমন দুর্ভাবনায় পড়িতে হইত না। তাহাকে বউ পাইলে উহারা বর্ত্তিয়া যাইত।

তবে কিশোর মহাদেবের মত এমন বরটি তাহার জুটিত না, এই যা আপশোষের কথা।

মার অবসর কম, খুব ভোরে আধঘণ্টাখানেক মেয়েকে বুঝাইবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন, তার পর মাঝে মাঝে নানা ছলে মেয়ের ম্লান মুখখানি দেখিয়া যাওয়ার বেশী সময় করিয়া উঠিতে

পারেন নাই। এখন আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। নূতন জামাইকে আদর করিয়া খাওয়াইবার লোক আবশ্যকের অতিরিক্তই ছিল তথাপি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'যা ত মা ক্ষেন্তি, জামায়ের খাওয়াটা একটু ত্যাখ তো গিয়ে।'

'সে কি মাসীমা? জামাই একা খাচ্ছে না কি?' ছেলেকে কাঁখে তুলিয়া ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মা বলিলেন, 'পাতের কাছে বস্‌লি আর উঠে এলি কিছুই তো খেলি না ইন্দু? একটু দুধ এনে দি' চুমুক দিয়ে খেয়ে ফ্যাল্‌ মা, খিদেয় নইলে যে সারা হয়ে যাবি?'

মার গলার স্বর এমন করুণ শোনাইল যে দুধ খাইতে ইন্দু একেবারে অস্বীকার করিতে পারিল না, বলিল, 'এখন না মা, পরে খাব'খন।'

'পরে আর কখন খাবি মা, পর কি আর আছে? জামায়ের খাওয়া হ'লে সবাই তোকে আবার ছেঁকে ধরবে, তখন কি আর খেতে পারবি? এখুনি খেয়ে নে।'

'আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না মা!'

মার চোখ সজল হইয়া উঠিল।—'তা কি আমি বুঝি না মা, তবু খেতে হবে। রাস্তায় তুই খিদেয় কষ্ট পাচ্ছিস্‌ ভেবে আমি এখানে কি করে থাকব বল দেখি? একটু দুধ তুই খা ইন্দু, লক্ষ্মী মা আমার।'

একটু মানে এক বাটি এবং বাটিটাও নেহাৎ ছোট নয়। দুধের পরিমাণ দেখিয়া ইন্দু ভয় পাইল। মার মুখ চাহিয়া সবখানি দুধ কোনমতে যে গেলা যায় না এমন নয়, কিন্তু রাস্তায় বমি

হওয়ার আশঙ্কা আছে। তবু খাইতে হইল তাহাকে সবটাই। সে যেন অবোধ অবাধ্য শিশু এমনি ভাবে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তোষামোদ করিয়া বকিয়া মা তাহাকে সবটুকু দুধ খাওয়াইলেন, ভিজা হাত মুখে বুলাইয়া নিজের আঁচলে মুখ মুছাইয়া দিলেন, চুপি চুপি বলিলেন, 'এক কাজ করবি ইন্দু? খানিকটা সন্দেশ দলা করে কলাপাতায় মুড়ে দিচ্ছি, সঙ্গে নিবি? রাস্তায় যদি খিদে পায়—'

মাগো, মেয়েকে যে তিনি এত ভালবাসেন আগে তাহা কে জানিত! দুদিন আগেও ইহাকে কারণে অকারণে কত মুখঝামটা দিয়াছেন, কত লাঞ্ছনা করিয়াছেন। সে সব কথা ভাবিলেও আজ চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চায়। দেখিতে দেখিতে মেয়ের দেহ দীঘল হইয়া উঠিল, দুধ না, ভাল মাছটুকু না; তবু যেন কলাগাছের মত হু হু করিয়া বাড়িয়া চলে, অথচ বর জোটে না। মেয়ের দিকে তাকাইলেও বুকের ভিতরটা যেন তাহার হিম হইয়া যাইত। এক বছর ধরিয়া পেটের মেয়ে যেন শত্রুরও বাড়া হইয়া ছিল। এমন রাজরাণীর মত আজ ইহাকে মানাইয়াছে, এমন গড়ন, এমন মাজা রঙ্, এমন লাবণ্য,—কিছুই কি তখন চোখে পড়িত ছাই! মনে হইত, এমন কুরূপা মেয়ে ভূভারতে আর জন্মায় নাই।

চিবুক ধরিয়া উঁচু করিয়া মা ইন্দুর লজ্জিত মুখখানি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিয়া ভাবিলেন, বড় অন্যায় হইয়াছিল, বিনা দোষে মুখ বুজিয়া কত দুঃখই এ মেয়ে তাঁহার সহিয়াছে! বিন্দুর বেলা সাবধান থাকিবেন, আর অমন করিয়া যখন তখন বকিবেন না, যা তা খোঁটা দিবেন না।

আশ্চর্য্য এই, মেয়ে যে প্রায় আধাআধি সর্ব্বনাশ করিয়া চলিল এ কথা মার মনেও পড়িল না। তেরো বিঘা ধানের জমি একেবারেই গিয়াছে, স্বামী-পুত্র লইয়া মাথা গুঁজিবার এই ঠাঁইটুকু এগারশো টাকায় বাঁধা পড়িয়াছে। কত মাস, কত বছর ধরিয়া স্বামীর অল্প আয়ের অধিকাংশ গ্রাস করিয়া এ বাড়ী মুক্ত হইবে কে জানে। কেমন করিয়া সংসার চলিবে, পাঁচ ছয় বছর পরেই বিন্দুর বিবাহ দিতে হইবে, তখন কি উপায় হইবে এ সব ভাবিলেও মাথা ঘুরিয়া যাওয়ার কথা, মা কিন্তু এখন ও-সব কিছুই ভাবিতেছিলেন না। ভাবিবার সময় অনেক জুটিবে, মেয়ে যে আজ তাঁহার মহা সমারোহে পর হইয়া যাইতেছে।

ইন্দু আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল,

'হ্যাঁ মা, খোকার ঘুম ভাঙেনি ?'

'জানিনে। ওর দিকে তাকাবারও সময় পেয়েছি কি সকাল থেকে ? সময় মত ওষুদও আজ বোধ হয় খাওয়ানো হয় নি।'

ইন্দু বলিল, 'আমি খাইয়েছি ওষুদ। বিকালে ডাক্তার বাবুকে আর একবার আনিয়ো মা। দেখে আসি খোকাকে একবার—'

ওদিকের ছোট ঘরটিতে পাঁচ ছয় বছরের একটি ছেলে শুইয়াছিল, সাত আটদিন ক্রমাগত জ্বরে ভুগিয়া ছেলেটি জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সাত মাইল দূরের গ্রাম হইতে ডাক্তারকে বার দুই আনা হইয়াছিল, জ্বরটা তিনি ঠিক ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু দুইচার দিনের মধ্যে কমিয়া যাইবে বলিয়া খুব জোরালো আশ্বাস ও ঝাঁঝালো ওষুদ দিয়াছেন। খোকা জাগিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিল,

মাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, সে সন্দেশ খাইবে।

মা বুঝাইয়া বলিলেন, 'আজ দিদি চলে যাবে, আজকেই তুই সন্দেশ খাবি খোকা? দিদিকে তুই ভাল বাসিস্‌নে বুঝি? তুই কাঁদিস্ ত ইন্দু—খুব কাঁদিস্ পাল্কীতে উঠে।'

খোকা সভয়ে কান্না থামাইয়া বলিল, 'আমি দিদির সঙ্গে যাবো।'

'যাস্। আগে তবে বার্লি খা। বার্লি না খেলে দিদি সঙ্গে নেবে না।—নিবি ইন্দু?'

ইন্দু কান্না চাপিয়া বলিল, 'না'।

মা বার্লি আনিতে চলিয়া গেলেন।

এ ঘরখানা খুবই ছোট, পুরোনো চাঁচের বেড়া, বিবর্ণ টিনের চাল। এককোণে এক বোঝা পাঁকাটি ঠেস দিয়া রাখা হইয়াছিল কখন কাৎ হইয়া পড়িয়াছে, বাঁশের তৈরি চৌকীর তলে সারি সারি গুড়ের হাঁড়ি সাজানো। দরজার বাহিরেই বাড়ীর কিষাণ গরুর জন্ত বিচালী কাটে, ঘরের মধ্যে খড়ের টুক্‌রা উড়িয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

এই ঘরেই খোকা জন্মিয়াছিল। ইন্দুর সহসা সে কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার আকস্মিক ও অপরিমিত আশঙ্কার মধ্যে যুক্তির সম্পূর্ণ তিরোভাব ঘটিল। মনে হইল, বিবাহের গোলমালে রোগা ছেলেটাকে যে এ ঘরে সরাইয়া আনা হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় নিয়তির হাত ছিল, ফলটা হয়ত ইহার শুভ হইবে না।

মনে মনে ইন্দু ভয় পাইল। কয়েক সেকেণ্ডের কল্পনায় সে যেন

ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ফেলিয়াছে। কুলুঙ্গিতে তিন চারিটা ওষুধের শিশি, চোখ তুলিয়া ইন্দু সেগুলি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, উপরের তাকে খোকার ময়লা রবারের বলটা কে যেন তুলিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের বুড়োটে খেয়ালের ঠিক উপরেই খোকার ছেলেখেলা।

'তোর বলটা তাকে কে তুলে রাখলে রে খোকা?'

'গদাইদা রেখেছে।' খেলিতে খেলিতে খোকার হাত যখন ব্যথা হইয়া গেল, গদাইদা তখন বলটা তুলিয়া রাখিল।—'শুয়ে শুয়ে বল খেলা বিচ্ছিরি, না দিদি?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা খোকা, বল খেলতে তুই খুব ভালবাসিস্?'

বল খেলিতে ভালবাসে না! বাসেই ত!

'দাঁড়া তবে, আসবার সময় পোড়াবাড়ী ঘাটের সেই মনোহারি দোকান থেকে তোর জন্যে দুটো বল কিনে আনব, তেমন বল তুই কখনও দেখিস্‌নি খোকা, তোর এটা তো ছোট্ট, সেগুলি এর ঠিক দুনো হবে,—দেখিস্। আর শাদা যেন ধপ্-ধপ্ করছে! ভাল হয়ে এক সঙ্গে তিনটে বল নিয়ে মজা ক'রে খেলবি, কেমন?'

একটু উৎসুক উদগ্রীব সুরেই ইন্দু কথাগুলি বলিল, বলের বর্ণনা শুনিয়া খোকার লুব্ধতা চরমে উঠিয়া যাইবে এ রকম একটা আশা যেন তাহার আছে। তাহার ফিরিয়া আসা অবধি বলের লোভে খোকা অশুভকে ঠেকাইয়া রাখিবে এমন যুক্তিহীন কথাও ইন্দু আজ এই একান্ত অসময়ে সম্ভব মনে না করিয়া পারিল না।

ঘরের পিছনেই ছিটাল, গোটা দুই কণ্টকাকীর্ণ বাবলা গাছের গোড়া হইতে ডোবার পাড়টা ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে। ডোবার এখন জল নাই, শুধু আগাছা আর কাদার একটু তলানি। একটা চাপা বাষ্পীয় দুর্গন্ধ ওখান হইতে উঠিয়া আসিতেছিল, কি যেন পচিয়া গিয়াছিল এখন রোদের তেজে শুকাইয়া উঠিতেছে। ইন্দুর মনে পড়িল বছর তিনেক আগে মার যখন কঠিন অসুখ হইয়াছিল তখন খোকাকে কাছে লইয়া শুইয়া প্রথম কয়েক রাত্রি যে গন্ধে তাহার ঘুম আসে নাই, এই দুর্গন্ধ যেন তাহারই অনুরূপ। আজ দুপুরে সেই ক'টি রাতদুপুরের নিরুপায় ক্রোধ ও বিরক্তি যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

এতক্ষণে ইন্দুর ভাল করিয়া কান্না আসিল, উজ্জ্বল উচ্ছ্বসিত কান্না; চাপিবার চেষ্টা করিয়াও সে চাপিতে পারিল না, খোকাকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। চোখে চাপা দেওয়া আঁচল তাহার চোখের জলে ভিজিয়া গেল।

কিন্তু বেশীক্ষণ সে কাঁদিল না, অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রান্ত ও নিস্তেজ হইয়া থামিয়া গেল। মনে হইল, একটু ঘুমাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিত। খোকার পাশে শুইয়া খোকার শীর্ণ তপ্ত দেহটি বুকে জড়াইয়া খানিকক্ষণের জন্য চোখ বুজিবার লোভ ইন্দুকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বরের খাওয়া বোধ হয় এতক্ষণে হইয়া গিয়াছে, আঁচাইয়া পান মুখে দিতে তাহার যতটুকু সময় লাগিবে ঠিক ততটুকু সময় ইন্দু তাহার ছোট ভাইটির বিছানায় একটু শুইতে চায় আজ।

বিদায় সত্যই সমারোহের ব্যাপার।

কয়েকটি অনুষ্ঠান আছে। সুন্দর কয়েকটি মেয়েলি আচার যথাবিহিত পালন করিতে হয়। প্রণামের ঘটাও কম নয়। উচ্চারিত অনুচ্চারিত আশীর্ব্বচন লিপিবদ্ধ করিলে একখানি চটি বই হয়।

প্রতিবেশিনীদের মন্তব্যগুলি (পরস্পরের প্রতি ফিস্ ফিস্ করিয়া কিন্তু বরকনে এবং অন্যান্য অনেকেরই সুশ্রাব্য স্বরে) চটি বইয়ে কুলায় না।

ইহাদের মধ্যে বয়স্করা স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারেন তিনটি ছেলে মেয়ে কোলে লইয়াও শ্বশুরবাড়ী আসিতে তাঁহারা কত কাঁদিয়াছিলেন, যাহারা ছোট শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সময় খুব একচোট কাঁদিবার ভরসা তাহারা রাখে। ইন্দু যে কাঁদিল না, ইহাদের সকলের কাছেই তাই তাহা অসহ্য ঠেকিল। শব্দ করিয়া না কাঁদুক ঘন ঘন চোখও কি মুছিতে পারে না মেয়েটা?

'দেখ্‌লে রাঙামাসী? মেয়ে ধাড়ি ক'রে বিয়ে দেবার ফলটা একবার দেখলে? বর পেয়ে বর্ত্তেছেন! এক ফোঁটা জল নেই গা মেয়ের চোখে?'

প্রতিবাদ করে ক্ষেন্তি।

'রাঙামাসী আবার কি দেখ্‌বে কালো পিসি? ওর চোখ দুটোর দিকে তুমিই চেয়ে ছাখো। সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে চোখ যে ওর জবাফুল হয়ে আছে এতো কাণাও দেখতে পায়।'

কালো পিসি মুখ কালো করিয়া বলেন, 'কি জানি বাছা, কেঁদে না রাত জেগে চোখ জবাফুল হয়েছে—আজ-কালকার মেয়ে তোরাই ও-সব ভাল বুঝিস্!'

মুখ মুছিবার ছলে হরেন হাসি গোপন করে।

অথচ যে চোখ দুটির জবাফুল হওয়া নিয়া এই কৌতুক তাহা ঘোমটার আড়ালে গোপন হইয়াই থাকে, সে চোখে জল না কাজল ঘোমটা না তুলিলে তাহা আর নজরে পড়ে না। তা এই পুরানো মুখে ঘোমটাই এখানে দ্রষ্টব্য, ঘোমটা তুলিবার কৌতূহল ইহাদের কম। স্বামিগৃহে পা দিবামাত্র সেখানকার আবালবৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে যে কৌতূহলের প্রাচুর্য্য ইন্দুর মুখ খানিতে মুহুর্মুহু সিঁদুর ছড়াইয়া দিতে থাকিবে।

রওনা হওয়ার সময় হইয়া আসে, কিন্তু বিদায় দিয়াও বিদায় দেওয়া হয় না, বরকর্ত্তা তাগিদ দিতে দিতে উগ্র হইয়া ওঠেন, চারিদিক হইতে 'এই হ'ল' 'এই হ'ল' রব উঠিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করে, কনের বাবা ঠেঙানো জন্তুর মত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ক্রমাগত হাত কচলান, ওদিকে দিদির সঙ্গে যাওয়ার বায়না নিয়া খোকার কান্না আর থামে না।

ইন্দুর ইচ্ছা হয় এই অসহ্য অত্যাচারের হাত এড়াইতে ছুটিয়া পাল্কীতে উঠিয়া পড়ে। বেদনার এ বিরাট ভূমিকা কেন? থাকিবার যখন উপায় নাই তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল। উঠানে দাঁড়াইয়া না থাকা না যাওয়ার যন্ত্রণটা এমন সমারোহের সহিত ভোগ না করিলে কি নয়?

দাঁড়াইয়া থাকিতে ইন্দুর কষ্ট হয়। সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া আসিতেছে।

অঙ্গন-লগ্ন ছায়াটিই ইন্দু দেখিতে পাইতেছে, তাহাও ঘোমটার ভিতর দিয়া কয়েক হাত পরিধির মধ্যে অংশটুকু, কিন্তু মাথার

উপরে যে প্রকাণ্ড আমগাছটি চাঁদোয়ার মত নিজেকে ডালপালায় ছড়াইয়া দিয়াছে তার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া মুকুলের সমারোহ সে স্পষ্ট কল্পনা করিতে পারে। আষাঢ়ের শেষাশেষি এ গাছের ফল পাকিবে—খাইয়া শেষ করা যায় না এত ফল। কে জানে সে তখন থাকিবে কোথায়?

খোকা কাঁদিতেছে, খুব আস্তে কাঁদিতেছে, পায়ের নীচের ঘন ছায়া কেমন গাঢ় নীল হইয়া উঠিল, ঘোমটার প্রান্ত হইতে একটা ধোঁয়াটে কুয়াসা উঠান পর্য্যন্ত নামিয়া যাইতেছে,—তবু খোকা কাঁদিতেছে, অনেক দূরে, তাল-শিমুলীর চেয়ে অনেক দূরে ঝিঁঝির ডাকের মত কেমন ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া খোকা কাঁদিতেছে, শুনিতে শুনিতে ইন্দুর মাথার মধ্যে একটা দুর্ব্বোধ্য ঝম্ ঝম্ শব্দ আরম্ভ হইল এবং পর মুহূর্ত্তে সমস্ত উঠানটা বার কয়েক দুলিয়া শব্দহীন অন্ধকারে তলাইয়া গেল।

দুই হাত বাড়াইয়া উঠানটা ধরিতে গিয়া সে উঠানেই টলিয়া পড়িয়া গেল।

হরেনই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, কিন্তু ধরিয়া রাখিল না। আস্তে আস্তে উঠানে নামাইয়া দিয়া বাকী কর্ত্তব্যের ভার অন্য সকলের উপর ছাড়িয়া দিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল।

চারিদিকে ভারি চেঁচামেচি আরম্ভ হইল। কি হইল এবং যা হইল তা কেমন করিয়া হইল জানিতে চাহিয়া, জল ও পাখার দাবি জানাইয়া সকলে বিষম হট্টগোল বাধাইয়া দিল, ভূলুণ্ঠিতা কন্যার মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া মা বার বার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, মেয়েরা একবাক্যে হা-হুতাশ করিল।

তারপর জল আসিল, পাখা আসিল, ইন্দুর সীঁথির আল্‌গা সিঁদুর জলে ধুইয়া গেল, তাহার রাঙা চেলিতে উঠানের কাদা লাগিল এবং প্রায় চার মিনিট সময় সকলকে ভীতসন্ত্রস্ত বিহ্বল ও উত্তেজিত করিয়া রাখিয়া ইন্দু চোখ মেলিয়া তাকাইল। চারিদিকে চাহিয়া সে বলপ্রয়োগে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মার দৃঢ় আলিঙ্গন ছাড়াইতে পারিল না।

মা বলিলেন, 'শুয়ে থাক্ মা, শুয়ে থাক্;—ও শ্রীহরি ও মধুসূদন, একি বিপদ ঘটালে!'

যাত্রা আধঘণ্টা খানিক পিছাইয়া গেল।

ইন্দুর আকস্মিক মূর্চ্ছার কারণ সম্বন্ধে গবেষণা হইল প্রচুর। উপবাস, দুর্ব্বলতা, মনোকষ্ট, গ্রীষ্মাতিশয্য এবং 'ঢংলো ঢং, ঢং করে মেয়ে মূর্চ্ছো গেলেন এ আর বুঝি না,' এই অনুমান কয়টিই প্রাধান্য পাইল বেশী। অবশেষে সাব্যস্ত হইল যে, দুর্ব্বলতা নয়, অমন স্বাস্থ্যবতী মেয়ের আবার দুর্ব্বলতা কিসের, গরমটাই আসল কারণ। সহজ গরমটা পড়িয়াছে আজ? বসিয়া থাকিতে থাকিতেই লোকের ভির্মি লাগিবার উপক্রম হয়।

ছেলের বাবা কিন্তু গরমের অপরাধটা মানিয়া লইয়া মেয়ের বাবাকে অত সহজে রেহাই দিলেন না। বলিলেন, 'একি কাণ্ড মশাই? ফাঁকি দিয়ে একটা মৃগী রোগীকে ঘাড়ে চাপালেন?'

ইন্দুর বাবা ভয়ে ভয়ে বলিলেন, 'আজ্ঞে মৃগী রোগী নয়, জীবনে আর কখনও ওর ফিট হয়নি। আজ গরমে—'

'গরম! কিসের গরম! গরম বলিয়াই ফিট হইবে না কি?—

বলি, গরম লাগল কি একা আপনার মেয়ের? কই, এই ত এতগুলি মানুষ আছে এখানে আর কারো ত ফিট হল না, বেয়াই মশাই?'

পাত্রপক্ষের জনৈক মাতব্বর যোগ দিলেন 'বেহায়া মশায় বলুন, দাদা। বাবা, এ যে দিনে ডাকাতি!'

এ সমস্তের আর জবাব কি, ক্রুদ্ধ বৈবাহিকের সামনে বিপাকে-পড়া নৌকার মত ইন্দুর বাবা টল্‌মল্‌ করিতে লাগিলেন, তাঁর বংশ মৃগীরোগীর বংশ নয়, শুধু এই অস্বীকৃতির হালে কোন মতে সামলান গেল না। রফা হইল তিন-শ টাকায়। বরের বাবা পাষণ্ড নন, মূর্চ্ছার ব্যারাম আছে বলিয়াই পুত্রবধূকে তিনি ত্যাগ করিতে পারিবেন না, চিকিৎসা করিয়া বউকে তিনি আরাম করিবেন। মেয়ের চিকিৎসার খরচ মেয়ের বাবা যৎকিঞ্চিৎ আগাম দিবেন ইহা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়।

তা নিশ্চয় নয়, কিন্তু সঙ্গতি? মুখর জনতার মধ্যে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ইন্দুর বাবা ভাবিতে লাগিলেন যে, মেয়ের শুভবিবাহে শুভ যে কাহার হইল তাহাই ভাবনার বিষয়।

উত্তেজিত বেদনায় হৃদয় ভাঙিয়া যাওয়ার সময় চার মিনিট তাহাকে ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া রাখার জন্য ভাগ্য ডাক্তারকে যে তিনশ' টাকা ঘুষ দিতে হইয়াছে ইন্দু তাহা জানিতে পারিল না। জানাইয়া যাহারা দিত মেয়েকে এক প্রকার কোলে করিয়া পাল্কীতে তুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত মা তাহাদের সংযত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মর্ম্ম-বেদনার ব্যূহ ভেদ করিয়া আর কেহ ইন্দুর নাগাল পায় নাই।

পাল্কীর মধ্যে হরেনের সান্নিধ্যে মূর্চ্ছার জন্য ইন্দু তাই কেবল

লজ্জাতেই মরিয়া যাইতেছিল,—বাধ্য হইয়া একটু একটু চেনা বরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইবার মধুর লজ্জা।

পাল্কী তখন আটজন বেহারার কাঁধে রাইঘোষাণীর মাঠ ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। অন্য পাল্কী চারখানা পিছাইয়া পড়িয়াছিল, হরেন পাল্কীর দরজা খুলিয়া দিল। বলিল, 'ঘামে সেদ্ধ হওয়ার চেয়ে এ গরম বাতাসও ভাল। কি বল?'

ইন্দু কিছুই বলিল না, উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল।

বাধা দিয়া হরেন বলিল, 'না না, উঠো না, শুয়ে থাক।'

ইন্দু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, 'আপনার কষ্ট হচ্ছে।'

একদিকে তরুলতাহীন প্রান্তর, অন্যদিকে গ্রাম ও ক্ষেত খামার, ইহারই মধ্য দিয়া অসময়ের যাত্রী দুটি এমনি ভাবে সর্ব্বপ্রথম পরস্পরের সুখ-সুবিধার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিল। পাল্কী বেহারাদের পায়ে পায়ে যে ধূলা উঠিল, রাইঘোষাণীর মাঠের বাতাস তাহা কোন্‌দিকে উড়াইয়া দিতে লাগিল তাহার চিহ্ন মাত্র রহিল না।

খানিক পরে পাল্কী সাতগাঁয়ে প্রবেশ করিল।

হরেন জিজ্ঞাসা করিল এ গাঁয়ের নাম জান, ইন্দু? আসবার সময় শুনেছিলাম, ভুলে গেছি?

পাল্কীর কোণে জড়সড় ইন্দু জবাব দিল, 'সাতগাঁ।'

গ্রামটিকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য হরেন পাল্কীর বাহিরে মুখ বাড়াইল। দেখিল, একটা ময়রার দোকানের পরে পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের তলে একটি কালো ছেলে

দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একখানা বই। বকুল গাছের ছায়ায় বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে পাল্কীর শব্দ শুনিয়া ছেলেটি কৌতূহলবশে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, হরেন এইরূপ অনুমান করিল।

তারপর আরও কত গ্রাম, কত মাঠ পার হইয়া সন্ধ্যার একটু আগে পাল্কী ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছিল। ষ্টীমার তখন সবে আসিয়া নোঙর ফেলিয়াছে। নদীর অপর তীরে একটি চিতা প্রায় নিবিয়া আসিতেছিল। আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া হরেন বলিল, পথে চিতা দেখলে শুভ হয়। তোমায় আমায় খুব মনের মিল হবে, হবে না?

যেন পথে চিতা না দেখিলে তাহাদের মনের মিল হইতে বাকী থাকিত!

প্রকৃতি

দশ বছর পরে দেশে ফেরাটা সাধারণতঃ যথেষ্ট উত্তেজনার ব্যাপার। তবে সকলের পক্ষে নয়। সংসারে এমন অনেক মানুষ থাকে, জীবন যাহাদের এমন শিক্ষাই দেয় যে প্রত্যাশা করিতে তারা ভুলিয়া যায়। দেশ-বিদেশ, আপন-পরের পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। যেখানে বাস করে তাই হয় তাহাদের দেশ, কারণে অকারণে যাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তারাই হয় আত্মীয় বন্ধু।

হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া দাঁড়ানোর সময় [illegible] বিচলিত হওয়াই অমৃতের পক্ষে উচিত ছিল। সর্ব্বস্ব হারাইয়া একদিন যে-দেশ সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, আজ আবার সেই সর্ব্বস্বের তিনগুণ সঞ্চয় লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। কত বিচিত্র অনুভূতি জাগিতে পারিত অমৃতের, কত বিভিন্ন ভাবাবেগে সে উদ্বেল হইয়া উঠিতে পারিত। সে সব কিছুই হইল না। শুধু এই কথাটা তার মনে পড়িয়া গেল যে একদিন এই ষ্টেশনেই থার্ডক্লাসে উঠিয়া সে দেশত্যাগ করিয়াছিল, আজ এইখানে নামিতেছে ফাষ্টক্লাস হইতে। বিশেষ করিয়া এই কথাটা কেন মনে পড়িল কে জানে! হঠাৎ পথের ভিখারী হইয়া দেশ ছাড়িবার চেয়ে থার্ডক্লাসে উঠিয়া দেশ ছাড়াটাই কি তার কাছে বড় দুর্ভাগ্য হইয়া উঠিয়াছিল? ইংরাজ সহযাত্রীটির নিকট বিদায় লইবার সময় আজ যেন সেদিনকার সেই বোম্বাই কামরায় অপরিচ্ছন্ন ঘর্ম্মাক্ত মানুষগুলির মধ্যে বসিয়া থাকিতে তার যে অসহ্য কষ্ট হইয়াছিল এটুকু ছাড়া স্মরণ করিবার আর কিছুই সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

গরীব হইয়া সে ছিল প্রায় বছর তিনেক। এই তিন বছরের ইতিহাস স্মরণ করিতে গেলে এই ধরণের স্মৃতিগুলিই যেন সবচেয়ে

স্পষ্টভাবে মনে পড়ে—কবে কোথায় নোংরা মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে তার অসহ্য কষ্ট হইয়াছিল। মনের মধ্যে যে একটা বিস্ময়কর রহস্যের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। একি আশ্চর্য্য প্রকৃতি তার যে, দারিদ্র্যের চেয়ে দরিদ্রকে সহ্য করিতে তার কষ্ট হইয়াছিল বেশী?

অধিকাংশ মালপত্র এবং গাড়ীটা অমৃত আগেই কলিকাতায় চালান করিয়া দিয়াছিল। সোফার গাড়ী আনিয়াছে। গাড়ীতে উঠিয়া সহরতলীতে সম্ভক্রীত নিজের পুরাতন বাড়ীটার দিকে চলিতে চলিতে এই কথাটাই অমৃত ভাবিতে লাগিল। টাকার অভিশাপ তার অজানা নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা যাদের আছে তাদের সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। প্রয়োজনের উপযুক্ত টাকা যাদের নাই তাদেরও তো সে সহিতে পারে না!

তবে ওদের জন্য একটা অনাবিল শ্রদ্ধা সে আজ দশ বছর মনের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে—বিশেষ করিয়া তার দেশের গরীব মধ্যবিত্ত মানুষগুলির জন্য। টাকার জন্য আজীবন ওরা লালায়িত থাকে, টাকার কাছে মাথা নীচু করিয়া জীবনের অনেক কিছু মহার্ঘ ওরা বিসর্জ্জন দেয়, তবু টাকাকেই ওরা মানুষের একমাত্র মূল্য বলিয়া ধরিয়া রাখে না—মনুষ্যত্বের অন্য মর্য্যাদাও বোঝে। নিজের জীবনে অমৃত এ জ্ঞান আহরণ করিয়াছে। এবং তার কটু স্বাদ আজও সে ভুলিতে পারে নাই। টাকার সঙ্গে কত সহজে সে টাকাওয়ালা বন্ধুদের হারাইয়াছিল! সুসময়ের বন্ধুদের সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদবাক্যটা জানে সকলেই, কিন্তু নিজের জীবনে সেটা ঘটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সে জানার অনেক পার্থক্য। ধনী সমাজটার প্রতি চিরস্থায়ী বিদ্বেষে অমৃতের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বিদেশে এই বিদ্বেষের তীব্রতা কম ছিল। ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্য যেন বিদেশী ধনীদের পক্ষে একটু ওকালতি করিত, মনে হইত ওরা ঠিক তার দেশের সেই টাকাওয়ালা মানুষ-গুলির মত নয়, যাদের কাছে মানুষের খাতির শুধু ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কটার অনুপাতে। রাখাল হালদার, যার টেনিশ কোর্টে যার ছেলেমেয়ের সঙ্গে টেনিশ খেলিয়া তার কম পক্ষে সাত জোড়া জুতা ক্ষয় পাইয়াছে, অথচ শেষবার যার বাড়ী গিয়া একেবারে বাহিরতম বসিবার ঘরটি পার হইবার অনুমতি সে পায় নাই, তার সঙ্গে বিদেশের নানা জাতি ও ধর্ম্মের পরিচিত ধনী লোকগুলির একজনের সাদৃশ্য সে খুঁজিয়া পাইত না। ওদের সঙ্গে তাই সে মিশিতে পারিত, তার জ্বালাভরা বিদ্বেষ তাকে দূরে সরাইয়া রাখিত না। দু'একজন অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী সেখানে যারা ছিল, শুধু তাদের সঙ্গেই ছিল তার বিরোধ। একটা ঠাণ্ডা উপেক্ষাপূর্ণ ভদ্রতা দিয়া এদের সে ঠেকাইয়া রাখিত, এতটুকু ঘনিষ্ঠতার সুযোগ দিত না। ওরা বাঙ্গালী বলিয়া নয়, ওদের টাকা ছিল বলিয়া।

ভাগ্যের বিপরীত বায়ুপ্রবাহে মনের আবেগ প্রায় শীতল হইয়া আসিলেও বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর জন্য একটা প্রশান্ত সহজ মমতা অমৃতের ছিল। দেশে আসিলেই যে জীবনটা তাহার আনন্দ ও সার্থকতায় ভরিয়া উঠিবে এ আশা অমৃতের এতটুকু নাই, তবু বাকী জীবনটা দেশে কাটানোই সে স্থির করিয়াছে। বাংলার জল বায়ু আর বাঙ্গালীর সাহচর্য্য—মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর। একটা ক্ষীণ তীক্ষ সঙ্কল্পও অমৃতের মনে আছে, কোন এক বাড়ীর গৃহস্থের সংসার

হইতে শান্ত সেবাপরায়ণা শাদাসিদে একটি মেয়েকে হয়ত একদিন সে ঘরে আনিবে।

নিজের এই বাড়ীখানা অমৃত একদিন বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল, ফিরিয়া আবার কিনিতে তাহাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই, টাকাও দিতে হইযাছে অনেক বেশী। তা হোক, এ বাড়ীর গেট হইতে তার নাম লেখা পিতলের পাতখানা একদিন খসিয়া পড়িয়াছিল, আজ আবার তেমনি একখানা পিতলের ফলক সেখানে আঁটিয়া দিতে পারার মধ্যে যে গর্ব্ব ও আনন্দ আছে তার জন্ম কোন মূল্য দিতেই সে কুণ্ঠিত হইত না। তার পুরানো আসবাবপত্রও অনেক রহিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ী ঘুরিয়া দেখিয়া অমৃত অত্যন্ত আরাম বোধ করিল। মনে হইল এমনিভাবে আবার এ বাড়ীটা দখল করিবার জন্ম দশ বছর ধরিয়া তার ভিতরে যে কতবড় জোরালো আকাজ্ক্ষা লুকাইয়া ছিল, এতকাল সে তাহা ধরিতে পারে নাই। পুরানো দিনের পুরানো প্রথায় বাঁচিবার সাধ সে ত্যাগ করিযাছে, তবু একি আশ্চর্য্য যে শুধু তার পুরানো বাড়ী আর পুরানো আসবাবগুলি তাকে এতখানি খুসী করিয়া তুলিতে পারিয়াছে! তা এমনি হইবে হয় ত। এখানে বাস করিবার সময় যে মানুষগুলির সঙ্গে তার ভাণ-করা প্রীতির সম্পর্ক ছিল, ঘৃণা সে করে তাদের। এখানকার জড় পদার্থের নীরব অভ্যার্থনাকে সে সাগ্রহে গ্রহণ করিবে না কেন? এই গৃহ ও আসবাবের বিরহে সে কি একদিন কম কাতর হইয়াছিল!

দোতলায় সামনের দিকের প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়াইয়া অমৃত

চারিদিকে তাকায়, কয়েকটা নতুন বাড়ী উঠিয়াছে, আশে-পাশে, গিরিনবাবুর প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীটাকে প্রায় আড়াল করিয়া কে যেন আরও বড় আরও উঁচু একটা বাড়ী তুলিয়াছে। গিরিনবাবু! অমৃতের প্রতি কত গভীর স্নেহ ছিল বলিয়া তিনি তার এগার হাজার টাকার গাড়ীটা একেবারে হাতে-হাতে নগদ পাঁচ হাজার দিয়া কিনিয়া লইয়াছিলেন! যে রকম সাবধানী সতর্ক মানুষ গিরিনবাবু, দু'তিন হাজার লাভ রাখিয়া বেচিতে না পারিয়া থাকিলে হয়ত আজও সেই গাড়ীতে তিনি চাপিয়া বেড়ান! রাস্তার মোড়ে রামলালের পানের দোকানটা এখনো আছে, রামলাল একদিন ছিল অমৃতের বেয়ারা। দীনবেশে পায়ে হাঁটিয়া চোরের মত অমৃত যেদিন শেষবার এখানে আসিয়াছিল, রামলাল ঝুঁকিয়া তাকে সেলাম করিয়াছিল। সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময় মোটর থামাইয়া ওর সঙ্গে অমৃত কিছুক্ষণ কথা বলিবে। ওর সেই অযাচিত সেলামটি তো ভুলিবার নয়!

কার কার বাড়ী গিয়া দেখা করিয়া আসিবে, অমৃত তা অনেক আগেই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল, পরদিন সকালে সে বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই গেল আলিপুরের উকীল প্রমথবাবুর বাড়ী। অমৃতের শেষ মামলাটা প্রমথবাবুই বিনা 'ফি'তে করিয়া দিয়াছিলেন, তারপর অসুস্থ অমৃতকে ছ'মাস বাড়ীতে রাখিয়া করিয়াছিলেন চিকিৎসা। প্রমথবাবুর পশার তেমন ভাল ছিল না, কোনমতে সংসার চালাইতেন। অমৃত তাকে অনেকবার নানা উপলক্ষে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রমথবাবুর টাকা চাহিবার ভণিতায় এবং টাকা পাইয়া উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া

চিঠি লিখিবার কায়দায় অমৃতের মনে আঘাত লাগিয়াছে বটে, কিন্তু সে আঘাত সে জোর করিয়া ভুলিয়া গিয়াছে। নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইযাছে যে হয় ত ওদের চিঠি লিখিবার প্রথাই এইরকম।

পথচারীদের দুদিকের বাড়ীর গাযে ঠেলিয়া দিয়া সঙ্কীর্ণ গলিতে সন্তর্পণে গাড়ী প্রমথবাবুর বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। প্রমথবাবু নিজে বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া অমৃতকে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁর বড় ছেলে অবিনাশ বাংলা কাগজ পড়িতেছিল, অমৃতকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই যে দাঁড়াইল, মনে হইল আর সে বসিবে না। বয়সে সে অমৃতের সমবয়সীই হইবে, অমৃত যখন এ বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল সাত দিনের মধ্যে ওর সঙ্গে তার নিবিড় অন্তরঙ্গতা জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তারপর দশ বছর কাটিয়া গিযাছে এবং আজ তো অমৃত আশ্রয়-ভিখারী হইয়া আসে নাই। আজ অমৃতের সঙ্গে বন্ধুর মত কথা বলা ওর পক্ষে বড় কঠিন।

প্রমথবাবুর সমস্ত চুল ধবধবে শাদা হইয়া গিয়াছে, দশ বছরে তিনি এত বুড়া হইয়া পড়িবেন প্রমথ তা ভাবিতেও পারে নাই। সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের পীড়নে ওদের অস্বস্তি-দেখিয়া অমৃত নিজেই কথা আরম্ভ করিল, সকলের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিল। কিছুক্ষণ পরে আলাপ আলোচনা অনেকটা সহজ হইয়া আসিল বটে কিন্তু একেবারে স্বাভাবিক হইতে পারিল না। তখন সহসা অমৃতের মনে পড়িল, সেবারও এমনি হইয়াছিল, সে যখন এ বাড়ীতে আশ্রয় লইতে আসিয়াছিল। কথা বলিতে গিয়া সে যেমন সব সময় সতর্ক

হইয়া থাকিত কি বলা উচিত আর কি বলা উচিত নয়, তেমনি সাবধানতা আজ ওদের মুখের কথাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

ক্ষণকালের জন্য অমৃতের মুখে একটা বিপন্নভাব ফুটিয়া উঠিল। হাতে মুখে ও উঁচু পেটে ভাত-মাখা অবস্থায় বছর চারেকের একটা উলঙ্গ ছেলে হঠাৎ ঘরে ঢুকিবামাত্র শাঁখাপরা দুটি শীর্ণ হাত তাহাকে ছিনাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। ঘরের মেঝেটা সেঁতসেঁতে—একটা সোঁদা গন্ধ অমৃতের নাকে লাগিতেছিল। সে আসিবে বলিয়া যে বাড়ী ঘর একটু সাফ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়—তবু চারিদিক অপরিচ্ছন্ন, নোংরা। শুধু ঝুল পরিষ্কার করিয়া কে বিবর্ণ দেয়ালে শুভ্রতা আনিতে পারে? ঝাঁটাইয়া সাফ করিতে পারে মেঝের গর্ত? কেমন একটা দুর্বোধ্য কষ্ট হইতে থাকে অমৃতের, ছোট সাইজের পোষাকের মত কি একটা কঠিন আবরণ যেন তাকে শক্ত করিয়া চাপিয়া রাখে। তার রুমালের মৃদু দামী গন্ধটা যেন হঠাৎ উগ্র হইয়া তাঁকে ঘিরিয়া জড়ো হইতে থাকে, এখানকার অপরিচিত ও অস্বস্তিকর গন্ধকে আমল দিবে না। নিজের বসিবার ভঙ্গীতে সহসা সে আবিষ্কার করে একটা আবেস-শূন্য সন্তর্পণ সাবধানতা,—চেয়ারের হাতায় হাত রাখিতে, কালো তৈলাক্ত পিঠটায় ঠেস দিতে প্রথম হইতে সে সঙ্কুচিত হইয়া আছে। এমন করিলে তো চলিবে না! এখানে সে আপন-জনকে খুঁজিতে আসিয়াছে, সর্ব্বদা আসিবে যাইবে, প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করিবে, তার নিঃসঙ্গ জীবনে এ বাড়ীর মানুষগুলি হইবে সঙ্গী। এমন কাঠ হইয়া ওদের কাঠের চেয়ারে বসিয়া থাকিলে ওদের সে আপন করিতে পারিবে কেন?

প্রতিমুহূর্ত্তে অমৃত অন্দরে যাওয়ার আহ্বান প্রত্যাশা করিতেছিল কিন্তু কেউ ডাকিল না। বার দুই ভিতরে আসা যাওয়া করিয়া অবিনাশ এক রেকাবি খাবার ও এক গ্লাস জল লইয়া আসিল, তারপর আনিল চা। এখানে খাইতে হইবে জানিয়া অমৃত কিছু খাইয়া আসে নাই, ক্ষুধা পাইয়া ছিল। সামনে খাবার দেখিয়া জাগিয়া ওঠার বদলে সে ক্ষুধা যেন ঘুমাইয়া মরিয়া গেল। এঁটো বাসন ছড়ান শ্যাওলা ধরা কলতলায় ছাই দিয়া মাজিয়া ময়লা ন্যাকড়া বুলাইয়া রেকাবি গ্লাস ধোয়া হইয়াছে, চায়ের কাপটার বাঁকানো হাতলটার খাঁজে লাগিয়া আছে বাদামী রঙের একটু শুকনো সর। চা যে তৈরী করিয়াছে, কে জানে কোলে তার ছোট ছেলে ছিল কি না, যার মুখ দিয়া লাল ঝরে আর নাক দিয়া জল?

মৃদু একটু হাসিয়া অমৃত বলিল, 'আমি তো কিছু খাব না কাকা। খেয়ে বেরিয়েছি।' মুখের কুঁচকানো চামড়া আরও কুঁচকাইয়া প্রমথও সবিনয়ে হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার উপযুক্ত আদর যত্ন করি সে ক্ষমতা তো নেই বাবা, সামান্য কিছু মুখে দাও?'

অবিনাশ বলিল, 'মিষ্টিফিষ্টি খেতে বোধ হয় ভালবাসেন না আপনি, বরং কেকটা খান, ভাল কেক।'

অর্দ্ধেকটা মন প্রতিবাদ করিতেছিল,—'এ চলিবে না, দশ বছর ধরিয়া সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছ, এ বাড়ীতে ঢুকিয়া ঘরের ছেলের মত চাহিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া খাবার খাইবে, সেই আশায় সকালে চা পর্য্যন্ত পান কর নাই: এসব তোমাকে খাইতেই

হইবে।' কিন্তু খাবারগুলি মুখে করার কথা ভাবিতেও গা যেন অমৃতের ঘিন ঘিন করিয়া উঠিতেছিল। তার বাবুর্চিখানায় এক কণা ধূলি জমিতে পায় না, তার বাবুর্চিরা ধব্‌ধবে উর্দি পরে, তার খাদ্য কারো হাতের স্পর্শ পায় না, তার থালা, বাটি, কাপ, ডিস, সাবান সোডা গরম জলে ধোয়া হয়। ময়রার দোকানের এসব খাবার, রুটির দোকানের এ কেক সে মুখে তুলিবে কি করিয়া? সাত দিনের বাসি সর-লাগানো চায়ের কাপে কেমন করিয়া চুমুক দিবে?

এবার অমৃতের হাসিটা ক্লিষ্ট দেখায়। বলে, 'খাবার জন্য ভাবছেন কাকা? কত আসব কত খাব, আজ খিদে নেই, নাইবা খেলাম? শরীরটা আমার তেমন ভাল নয়। একটু খাওয়ার অনিয়ম হলে অসুখ করে।'

প্রমথ কাতর ভাবে বলিলেন, 'চা-টা খাও?'

'চা? চা তো আমি খাই না।'

চাও সে খাইবে না অমৃত এই কথা বলিতে যাইতেছিল, তার বদলে এতবড় মিথ্যাটা সে যে কেন বলিয়া ফেলিল! সব কেমন ওলোট পালোট হইয়া যাইতেছে, দশ বছরের পোষণ করা সঙ্কল্পগুলি হইয়া উঠিতেছে অর্থহীন। তবু, প্রিয় কল্পনাগুলির এই শোচনীয় পরিণতির জন্য মনে যে বিষাদ আসিয়াছে, অম্লানবদনে একটা মিথ্যা কথা বলিয়া যতখানি অনুতাপ জাগিয়াছে, তার মধ্যেও যদি সে ভুলিতে পারিত অবিনাশের গলার খাঁজে মাটির রেখাটি দেখিতে পাওয়ার বিতৃষ্ণা! যাকে সে নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু করিবে ভাবিয়াছিল গলায় তার সূক্ষ্ম একটি মাটির রেখা থাকিলে কি

আসিয়া যায় ? সাবানে ধোয়া সযত্নে মাজা-ঘষা মানুষ তো সে চায় না, চায় সরল মনের অকৃত্রিম প্রীতি, যে মনে টাকা বিছানো নাই। তা ছাড়া এতো জানা কথাই যে বেশী টাকা যার নাই, জীবিকা অর্জ্জনের কঠোর তপস্যায় সকল সময় সে গলায় খাঁজের ময়লা তুলিবার সময় পায় না। এ সব যদি সে বরদাস্ত করিতে না, পারে, গরীব মধ্যবিত্তদের মধ্যে নিজের সামাজিক জীবনটি সে গড়িয়া তুলিতে পারিবে কেন ?

হঠাৎ অতিমাত্রায় আগ্রহ দেখাইয়া অমৃত বলিল, 'চলুন, কাকীমার সঙ্গে দেখা করে আসি।' বলিয়াই অন্দরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া অমৃত উঠিয়া দাঁড়াইল। বোঝা গেল তার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে পিতাপুত্র একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। কিছু না বলিয়া অবিনাশ ভিতরে চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চলুন।'

অবিনাশের মা তাড়াতাড়ি মটকার শাড়ীখানা পরিয়া ফেলিতে-ছিলেন, অমৃত যখন গিয়া প্রণাম করিল তখনও শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কি আশীর্ব্বাদ করিলেন অথবা একেবারে করিলেন কি না বোঝা গেল না। পাটি বিছাইয়া আগন্তুককে বসিতে দিলেন। কপালের সীমানায় কাঁচা পাকা চুলের প্রান্তে ছোট আবটি পর্য্যন্ত ঘোমটা কমাইয়া বলিলেন, 'ভাল আছ বাবা ?'

অমৃত সহজভাবে বলিল. 'ভালই আছি কাকিমা। আর সকলে গেল কোথায় ?'

'সুনীতির কথা বলছো ? সে বোধ হয় রান্না ঘরে।'

অমৃত বলিল, ডাকুন না, 'দেখি কেমন বড়-সড় হয়েছে।'

সুনীতি আসিল, ভাতমাখা উলঙ্গ ছেলেটাকে বাহিরের ঘর হইতে যে দুখানা শাঁখা-পরা হাত ছিনাইয়া আনিয়াছিল, সেই দু'হাতে আধ ময়লা শাড়ীর আঁচল ধরিয়া। এর বিবাহে অমৃত দুবারে প্রায় পাঁচ শ' টাকা পাঠাইয়াছিল। টাকাটা সার্থক হইয়াছে কি না সুনীতিকে দেখিয়া তা অনুমান করা গেল না। মনে মনে হিসাব করিয়া অমৃত দেখিল, তের আর দশে সুনীতির তেইশ বছর বয়স হইয়াছে। বয়সটা পূর্ণ যৌবনের যার ভাঙা একটা অংশও সুনীতির নাই।

এদিকে, আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রমথ ও অবিনাশের কি যেন পরামর্শ চলিতেছিল, খানিক পরে একটি আধাবয়সী বৌ, একটি বছর পনের বয়সের মেয়ে এবং একটি সুনীতির সমবয়সী বিধবা মেয়ে একে একে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, আর আসিল গুটিকতক ছোট-বড় ছেলে মেয়ে। কারো মুখে ভয়ের ছাপ, কারো চোখ দুটি কৌতূহলী। কিন্তু মুখে কারো কথা নাই। অমৃতের আবির্ভাবে এ বাড়ীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থমকিয়া থামিয়া গিয়াছে।

অমৃত বুঝিতে পারিল, বাড়ীর মেয়েদের তার সামনে বাহির করিবার সঙ্কোচটা বাড়ীর কর্ত্তা দু'জন এতক্ষণে কাটাইয়া উঠিয়াছেন।

সুনীতির ছোটবোন সুমতিকে দেখিয়া অমৃতের মানসিক বিপর্য্যয় বাড়িয়া গেল সবচেয়ে বেশী। অনেক বয়স হইয়াছে সুমতির, এবার বিবাহ না দিলেই নয়, ইতিপূর্ব্বে চিঠিতে অমৃতকে এই কথাটা প্রথম আভাসে ইঙ্গিতে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। সাহায্য চাহিবার সেটা ভূমিকা। মধ্যবিত্ত সংসারের সাদাসিদে

একটি মেয়েকে ঘরে আনিবার যে মৃদু কামনা অমৃতের মনে আসিয়াছিল, তারি প্রেরণায় সে কি সুমতিকে নিজের চোখে দেখিবার জন্য একটু বিশেষভাবে উৎসুক হইয়াছিল? দেখিতে সুমতি মন্দ নয়, পরনে একখানা আধময়লা শাড়ী থাকিলেও এই বয়সের স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার অভাব যে তার নাই তা বোঝা যায়, সলাজ নম্র ভাবটিও তার মনোরম, তবু যেন অমৃত মনে মনে ভয়ানক নিরাশ হইয়া গেল। কেমন করিয়া সে যেন বুঝিতে পারিল, সুমতির আগাগোড়া সবটাই ফাঁকি, এ তার চোখ-ভুলানো অস্থায়ী অভিনয়ের মূর্ত্তি, কোন মতে যাহাতে কারো বৌ হইতে পারে কিছুদিনের জন্য তাই সে এসব সংগ্রহ করিয়াছে—ওর আসল চেহারা অবিকল সুনীতির মত, দেহ এবং মনের। কপালে সিঁদুর উঠিলে দেখিতে দেখিতে ওর লাবণ্য ঝরিয়া যাইবে, নম্রতা হইবে তোষামোদ, স্নেহ হইবে পাগলামী, কিশোর বয়সের ভাবপ্রবণ সারল্য ঘুচিয়া গিয়া দেখা দিবে স্বার্থরক্ষার নিখুঁত কুটিলতা। এই বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি যেন আলোর মত অমৃতের মনে ফুটিয়া উঠে, সুমতিকে যাচাই করিতে আসিয়া সে পরীক্ষা করে সুনীতিকে। আধঘণ্টা আগে কুণ্ঠিত পদে ঘরে ঢুকিয়াছিল সুনীতি, আধঘণ্টার মধ্যে তার বুকে মমতার বান ডাকিয়াছে। শুধু তাই ডাকিয়া যদি ক্ষান্ত থাকিত, চোখবোজা অন্ধের মত অমৃত নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত, কিছু দেখিত না, কিছু বুঝিতে চাহিত না।

শুধু তা তো নয়।

অমৃতের লম্বা পাঞ্জাবীর তলার পকেট হইতে মাণিব্যাগটা পাটির উপর পড়িয়া গিয়াছিল, সুনীতির আঁচলের তলে সেটা চাপা

পড়িয়াছে। মুখখানা পাংশু সুনীতির, কথা ও হাসি যেন হিষ্টিরিয়া! সুনীতির স্বামীর চাকরী নাই? না থাক, সে নিজে এবং তার স্বামীপুত্র কোনোদিন অনাহারে মরিবে না।

সুনীতিই যে সুমতির একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি শুধু এই বিশ্বাসটি আঁকড়াইয়া থাকিবার মত নির্বোধ অমৃত নয়। একথা কোনমতেই ভোলা চলে না যে, অনেককাল সুনীতির স্বামীর চাকরী নাই। এবং সে যদি সুমতিকে বিবাহ করে এমন দিন হয় তো কখনো আসিবে না, সুমতির মুখের একটা অনুরোধ যখন সুনীতির স্বামীর মতো দু'একজনকে চাকরী জোগাইয়া কৃতার্থ করিতে পারিবেনা। সে সুমতিকে গ্রহণ করিলে সুমতি একদিন সুনীতি হইয়া উঠিবে এ আশঙ্কা গাড়ীতে উঠিয়া বসিবার আগেই অমৃতের মন হইতে মিলাইয়া গেল। তবে সুমতির সম্বন্ধেও আশা ভরসা করিবার কিছু থাকিবে কি না সন্দেহ। বিপরীত কারণে সেও এক নূতন রকম শোচনীয় পরিণতি লাভ করিবে। মধ্যবিত্ত সংসারের সরল কল্পনা-প্রবণ লাজুক কিশোরী সুনীতি অভাবে যদি এমন হইয়া থাকে, প্রাচুর্য্য সুমতিকে কি করিয়া দিবে কে জানে! দারিদ্র্য যদি সুনীতির সহ্য না হইয়া থাকে, টাকা সুমতির সহিবে কেন? টাকা না থাকার চেয়ে টাকা থাকা তো কম ভয়ঙ্কর নয়! অমৃতের চেয়ে কে তা ভাল করিয়া জানে?

অফিসের বেলা হইয়াছে। রাস্তার গাড়ী ও ফুটপাতে মানুষের ভীড়। গাড়ী কখনো জোরে, কখনো আস্তে চলিতেছিল। গাড়ীর গতি শ্লথ হইয়া আসিলে দুপাশের জনস্রোতের মুখগুলিতে অমৃত যেন আজ শুধু ক্ষোভ ও ক্ষুধা আবিষ্কার করিতে লাগিল। আজ যেন

নগ্নদেহগুলি বিশেষভাবে চোখে পড়িতেছে, একটি ভিখারীর চেহারা আড়াল করিয়া রাখিতেছে, হাজার মানুষকে। ওদের জন্য অমৃতের মনে গভীর মমতা আছে, আর আছে ওদের সান্নিধ্যের প্রতি নিবিড় ঘৃণা। হঠাৎ গাড়ী থামাইয়া দূর হইতে একটি ভিখারীকে সে একটা টাকা ছুঁড়িয়া দিল। আর একজনকে স্যাংচাইতে স্যাংচাইতে তাড়াতাড়ি কাছে আসিতে দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্তের মত ব্যাকুলভাবে সোফারকে তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইতে বলিল। এবং তার গাড়ীর মত প্রকাণ্ড আরেকটা গাড়ী পিছন হইতে আসিয়া ভিখারীটাকে চাপা দিলে একটু স্বস্তিই যেন সে বোধ করিল। ওই গাড়ীর সুবেশধারী স্থূলকায় আরোহীটিকে সে বিস্ময়কর তীব্রতার সঙ্গে ঘৃণা করে, কিন্তু স্যাংচাইতে স্যাংচাইতে ভিখারীটি গাড়ীর দিকে আগাইয়া আসিবার সময় সে যে ভাবে শিহরিয়া উঠিয়াছিল ওর গাড়ীখানা আগাইয়া আসিয়া পাশে থামিয়া গেলে দু'হাত দূরের মধ্যে এই মোটা ঘৃণ্য ধনীটিকে দেখিয়া অত্যন্ত মৃদুভাবেও তো তেমন শিহরণ তার জাগিল না? অর্থের অন্যায় অসমান বিতরণের পাপ যাদের দিয়া জীবনব্যাপী বীভৎস প্রায়শ্চিত্ত করায়, লাখটাকার শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাদের মধ্যে তাদের ভালবাসিয়া তাদেরই একজন হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে দশবৎসর ব্যাপী তপস্যার এ কি পরিণাম! দূর হইতে ওদের মমতা করিবার মানসিক বিলাসিতাটুকু কম-বেশী কা'র না থাকে? এই বিপুলদেহ ধনীটার সঙ্গে, মেনকার বাবা রাখাল হালদারের সঙ্গে তার তবে পার্থক্য রহিল কোথায়?

অমৃত নামিয়া গেল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া ভিখারীর নিষ্পেষিত

দেহটা দুহাতে বুকে তুলিয়া মোটরে শোয়াইয়া দিল। কাঁধের কাছে ভিখারীর বহুদিনের পুরাতন যে ক্ষত হইতে রক্ত চোয়াইয়া পড়িতেছিল, হাতের তালুতে সেটা চাপা দিয়া রাখিয়া সোফারকে বলিল, হাঁসপাতাল।

না, হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া অমৃতের মন আত্মপ্রসাদে হাল্কা হইয়া গেল না। সাময়িক উন্মত্ততা, যে সুনিবিড় জ্বালা আনিয়াছিল, সেটা জুড়াইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা জামা কাপড়ের স্পর্শে শরীরটা যেন তার কুঁক্‌ড়াইয়া যাইতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল সে যেন খানায় পড়িয়া গিয়াছিল, ডাষ্টবিনে। জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া সোফার তাহাকে বাড়ী লইয়া গেল। অমৃত ছুটিয়া গিয়া প্রবেশ করিল বাথরুমে।

সারাদিন দেহটা তার অশুচি মনে হইতে লাগিল, স্নায়বিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের মত নিজের স্নাত ও পবিত্র শরীরটার সেই আধ-ঘণ্টার অপব্যবহারকে সে যেন কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। সন্ধ্যার পর বিষণ্ণ বিরক্ত ও হতাশ মনে সে দোতলার বসিবার ঘরে বসিয়াছিল, বেয়ারা কার্ড আনিয়া দিল রাখাল হালদারের।

মৃদু একটু হাসিল অমৃত। সে জানিত রাখাল হালদার আসিবে। সে জানে সকলেই আসিবে—আজ অথবা কাল। ওদের লজ্জা নাই, দুর্ব্বলতা নাই। হালদার ঘরে ঢুকিলে অমৃত সাগ্রহে তার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। কতকাল নিঃসঙ্গ কাটিয়াছে। মানুষের সাহচর্য্য ছাড়া কি মানুষ বাঁচে, ঘৃণা করিয়া, ভাল না বাসিয়া? অন্ততঃ তার একটা খুব বাস্তব অভিনয় বিনা? হোক মিথ্যা, হোক ফাঁকি, মানুষের এই রকম প্রকৃতি।

ফাঁসি

সন্দেহ নাই যে, ব্যাপারটা বড়ই শোচনীয়। কে কল্পনা করিতে পারিত, বত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বাভাবিক শান্ত জীবন যাপন করিবার পর গণপতি শেষপর্য্যন্ত এমন একটা ভয়ানক ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িবে! শিক্ষিত সদ্বংশের ছেলে, কথায়, ব্যবহারে ভদ্র ও নিরীহ, জীবনে ধরিতে গেলে, একরকম সব দিক দিয়াই সুখী, সে কি না একটা লজ্জাকর হত্যাকাণ্ডের আসামী হিসাবে ধরা পড়িল! লোকে একেবারে 'থ' বনিয়া গেল। চরিত্রবান সংযত প্রকৃতির ভদ্রলোকের মুখোস পরিয়া কি ভাবেই সকলকে এতদিন খুনীটা ঠকাইয়া আসিয়াছিল! কি সাংঘাতিক মানুষ,—এঁ্যা? জগতে এমন মানুষও থাকে?

গণপতিকে পুলিশে ধরিবার পর ভীত-বিব্রত ও লজ্জায় দুঃখে আধ-মরা আত্মীয়স্বজনের চেয়ে পরিচিত ও অর্দ্ধপরিচিত অনাত্মীয় মানুষগুলির উত্তেজনাই যেন মনে হইতে লাগিল প্রখরতর। বিচারের দিন আদালতে ভিড় যা জমিতে লাগিল বলিবার নয়! টিকিট কিনিয়া রঙ্গমঞ্চে মিথ্যা নাটকের অভিনয় দেখার চেয়ে আদালতে নারী ঘটিত খুনী মোকদ্দমার বিচার দেখা যে কত বেশী মুখরোচক, সে শুধু তারাই জানে—রোজ খবরের কাগজে আগের দিনের আইন-আদালতের কার্য্যকলাপের বিবরণ পড়িয়াও যাদের কৌতূহল মেটে না, বেলা দশটায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া উকীল মোক্তারের মত যারা আদালতে ছুটিয়া যায়।

বাড়ীতেই গণপতির তিনজন উকীল। তার বাবা রাজেন্দ্রনাথ এককালে মস্ত উকীল ছিলেন, মাসে একসময় তিনি দশহাজার টাকাও উপার্জ্জন করিয়াছেন—এখন, সত্তর বৎসর বয়সে আর

কোর্টে যান না। বড়ছেলে পশুপতি বছর বারো প্র্যাক্‌টিশ করিতেছে,—বাপের মত না হোক নাম-ডাক তারও মন্দ নয়। গণপতির ছোট ভাই মহীপতিও উকীল, তবে আনকোরা নতুন! বড় উকীলের বড় উকীল বন্ধু থাকে—সমব্যবসায়ী কি-না! গণপতির পক্ষসমর্থনের জন্ত এতগুলি নামকরা আইনজ্ঞ মানুষ একত্রিত হইলেন, যে তাতেও মামলার গুরুত্ব গুরুতর রকম বাড়িয়া গেল। তবে গণপতিকে শেষ-পর্য্যন্ত বাঁচানো চলিবে কি-না সে বিষয়ে ভরসা করিবার সাহস এঁদেরও রহিল কম। মুস্কিল হইল এই যে, মামলাটা একেবারেই জটিল নয়। মামলা যত জটিল হয়, আইনের বড় বড় মাথাওয়ালা লোক মামলাকে জটিলতর করিয়া খুসী মত মীমাংসার দিকে ঠেলিয়া দিবার সুযোগ পান তত বেশী।

সহজ সরল ঘটনা। বাহির হইতে ঘরে শিকল তোলা ছিল আর স্বয়ং পুলিশ গিয়া খুলিয়াছিল—সে শিকল। ভিতরে ছিল মাত্র রক্তমাখা মৃতদেহটা আর ভয়ে আধ-পাগলা গণপতি। গোটা দুই টিকটিকি আর কয়েকটা মশা ছাড়া ঘরে আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। মশা অবশ্য মানুষ মারে,—মানুষ যত মানুষ মারে তার চেয়েও ঢের ঢের বেশী, তবু কেন যেন এই খুনের অপরাধটা মশার ঘাড়ে চাপানোর কথাটা গণপতির পক্ষের উকীলেরা একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না। তারা শুধু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, মৃতদেহটা আগেই ঘরের মধ্যে ছিল, পরে গণপতিকে ফাঁকি দিয়া ঘরে ঢুকাইয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দেওয়া হয়।

'বড় বিপদ, দয়া করে শীগগির একবার আসবেন?'—এই কথা বলিয়া গণপতিকে ফাঁকি দিয়াছিল একটি লোক, যার বয়স ছিল

প্রায় চল্লিশ, পরণে ছিল কোঁচানো ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী আর পালিশ করা ডার্ব্বি স্থ। গোঁপ দাঁড়ি কামানো, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, বিবর্ণ ফর্সা রঙ—লোকটাকে দেখিতে নাকি অনেকটা ছিল কলেজের প্রফেসারের মত। (কলেজের প্রফেসার হইলেই মানুষের চেহারা কোন বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে কি-না গণপতিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে সে জবাব দিতে পারে নাই, বোকার মত হাঁ করিয়া বিচারকের দিকে চাহিয়া ছিল।) এই লোকটি ছাড়া আরও তিনজন লোককে গণপতি দেখিতে পাইয়াছিল, বাড়ীর সরু লম্বা বারান্দাটার শেষে। তিন তলার সিঁড়ির নীচে অন্ধকারে তারা দাঁড়াইয়াছিল। (অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিলে গণপতি তাদের দেখিতে পাইল কেমন করিয়া?—বিচারক এইকথা জিজ্ঞাসা করিলে গণপতি এতক্ষণ বোকার মত চুপ করিয়া থাকিয়া জবাব দিয়াছিল যে বিচারক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাইয়াছিলেন।)

গণপতি যে কৈফিয়ৎ দিল, সেটা যে একেবারে অসম্ভব—তা অবশ্য বলা যায়না, অমন কত মজার ব্যাপার এই মজার জগতে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আট দশ জন দেশ-প্রসিদ্ধ উকীল ব্যারিষ্টারের চেষ্টাতেও এটা ভালমত প্রমাণ করা গেল না। গণপতির ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল!

ফাঁসি! বিচারক হুকুমটা দিলেন ইংরাজীতে, বাঙ্গালায় যার মোটামুটি চুম্বক এই যে গলায় দড়ির ফাঁস পরাইয়া গণপতিকে যথাবিধি ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে, যতক্ষণ সে না মরে। তবে হুকুমটা যদি গণপতির পছন্দ না হয়, সে ইচ্ছা করিলে আপীল করিতে পারে।

বুড়া রাজেন্দ্রনাথের ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দু'টি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় অন্ধ হইয়া গেল। গণপতির বোনেরা ও বৌদিরা যে কান্নার রোল তুলিল—সমস্ত পাড়ার আবহাওয়াটা যেন তাতে বিষণ্ণ হইয়া আসিল। গণপতির বৌ রমার এত ঘন-ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল যে, তার যে গাল দুটি লজ্জা না পাইলেও সারাক্ষণ গোলাপের মত আরক্ত দেখাইত, একেবারে কাগজের মত ফ্যাকাসে বিবর্ণ হইয়া রহিল। গণপতির বিধবা পিসী ঠাকুর-ঘরে এত জোরে মাথা খুঁড়িলেন যে ফাটা কপালের রক্তে চোখের জল তাহার খানিক খানিক ধুইয়া গেল।

যথা সময়ে করা হইল আপীল।

অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের দ্বারা গণপতির পক্ষে আরও কয়েকটা সাক্ষী এবং প্রমাণও সংগ্রহ করা হইল। তার ফলে, সন্দেহের সুযোগে গণপতি পাইল মুক্তি। যে লোকটাকে খুন করার জন্য গণপতির ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল, তাহাকে কে বা কাহারা খুন করিযাছে—পুলিশ তাহারই খোঁজ করিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিবার অধিকার জুটিল অপরাহ্নে—আকাশ ভরিবা তখন মেঘ করিয়াছে। অপরাহ্নে খুব ঘটা করিবা মেঘ করিলে মনে হয বৈ কি যে, এ আর কিছুই নয়, রাত্রিরই বাড়াবাড়ি। গণপতির কান্না আসিতেছিল। আনন্দে নয়, শ্রান্তিতে নয়, বিগলিত মানসিক ভাবপ্রবণতার জন্য নয়, সম্পূর্ণ অকারণে—একটা চিন্তাহীন স্তব্ধ অন্যমনস্কতায়। বন্ধু-বান্ধবের হাত এড়াইয়া সে পশুপতির সঙ্গে ব্যারিষ্টার মিষ্টার দে'র মোটরে উঠিয়া বসিল। মোটরের কোণে গা এলাইয়া দিয়া পশুপতি ফোঁস করিয়া ফেলিল

একটা নিশ্বাস, তারপর নিজেই মিষ্টার দে'র পকেটে হাত ঢুকাইয়া মোটা একটা সিগার সংগ্রহ করিয়া শাদা ধবধবে দাঁতে কামড়াইয়া ধরিল। মিষ্টার দে একগাল হাসিয়া বলিলেন,—যাক্।

কি যে তাহার যাওয়ার অনুমতি পাইল বোঝা গেল না। হয়ত গণপতির দুর্ভোগ, নয় ত অসংখ্য মানুষের পাগলামী ভরা দিনটা—আর নয় ত পশুপতি যে সিগারটা ধরাইযাছে—তাই। গণপতি পাংশু মুখ তুলিয়া একবার তাহার পরিতৃপ্ত উদার মুখের দিকে চাহিল, তারপর তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল বাহিরের দিকে, একবার এই গাড়ীতেই সে মিষ্টার দে'র সঙ্গে বসিয়া ছিল, কোথায় যাওয়ার জন্য আজ সে কথা ঠিক মনে নাই। গাড়ী ছাড়িবার আগে মিষ্টার দে হঠাৎ হাত বাড়াইয়া ফুটপাতের একটা ভিখারীর দিকে একটা আনি ছুড়িয়া দিয়াছিলেন। দানের পুণ্য আলোর মত সেদিন যেভাবে মিষ্টার দে'র মুখখানিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল আজ জীবনদানের পুণ্য তো তার চেয়ে প্রখর জ্যোতির রূপ লইয়া ফুটিয়া নাই! অবিকল তেমনি মুখভঙ্গী মিষ্টার দে'র—ভিখারীকে একটা আনি দিয়া তিনি যেমন করেন।

মানুষের অনুভূতির জগতের রীতিই হয়ত এইরকম—মুড়ি-মুড়কির এক দর! জীবন ফিরিয়া পাইয়া তার নিজেরও তেমন উল্লাস হইল কই? জীবনের কত অসংখ্য ছোট ছোট পাওনা তাকে এর চেয়ে শতগুণে উত্তেজিত করিয়াছে, নিবিড় শান্তি দিয়াছে, আনিয়া দিয়াছে দীর্ঘস্থায়ী মনোরম উপভোগ! সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া বাঁচিয়া থাকিবার প্রত্যর্পিত অধিকারটা যতভাবে যতদিক দিয়াই সে কল্পনা করিবার চেষ্টা করুক, জ্যোৎস্নালোকে

ছাদে বসিয়া রমার সঙ্গে একমিনিট কথা বলিবার কল্পনা তার চেয়ে কেত ব্যাপক, কত গাঢ়তর রসে রসালো!

দু'ভাইকে বাড়ীর দরজায় নামাইয়া দিয়া মিষ্টার দে চলিয়া গেলেন। তখন ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। গাড়ী-বারান্দার সিঁড়িতে বাড়ীর সকলে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; বৃষ্টি না নামিলে হয় ত প্রতিবেশীরাও অনেকে আসিত গণপতি নামিয়া প্রথমে রাজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিবে, পিসীমা তাই সে-পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। গণপতির প্রণাম শেষ হইতেই তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া হুহু করিয়া উঠিলেন কাঁদিয়া। এ কান্না অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়, সকলেই জানিত পিসীমা এমনিভাবে কাঁদিবেন! তাই খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাকে কাঁদিতে দিল। গণপতির কেমন একটা অস্বাভাবিক লজ্জা বোধ হইতেছিল। বাড়ী আসিবার জন্য মিষ্টার দে'র গাড়ীতে উঠিয়া কাঁদিবার যে জোরালো ইচ্ছা তাহার হইয়াছিল, হঠাৎ কখন তাহা লোপ পাইয়া গিয়াছে। নিজেকে লুকাইতে পারিলে এখন যেন সে বাঁচিয়া যায়। নিজের বাড়ীতে আপনার জনের আবেষ্টনীর মধ্যে ক্রন্দনশীলা পিসীমার বক্ষলগ্ন হইয়া থাকিবার সময় জেলখানায় তাহার সেই নিভৃত সেলটির জন্য গণপতির সমস্ত মনটা লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে, আর কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাটিলে তার মাথার মধ্যে একটা কিছু ছিঁড়িয়া যাইবে!

আর কেহ কাঁদিতেছে না দেখিয়া পিসীমা একটু পরে আত্মসম্বরণ করিলেন। তখন পশুপতির স্ত্রী পরিমল বলিল, কি চেহারাই তোমার হয়েছে ঠাকুরপো!

গণপতি গলা সাফ করিয়া মৃদু একটু হাসিয়া বিনয়ের সঙ্গে বলিল, আর চেহারা……?

যার জীবন যাইতে বসিয়াছিল, চেহারা দিয়া সে কি করিবে—এই কথাটাই গণপতি এমনিভাবে বলিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু শোনাইল অন্যরকম, মনে হইল, বৌদির স্নেহপূর্ণ উৎকণ্ঠার জবাবে সে যেন ভারি রূঢ় একটা ভদ্রতা করিয়াছে। গণপতিও হঠাৎ তাহা খেয়াল করিয়া মনে মনে অবাক্ হইয়া গেল। এমন শোনাইল কেন কথাটা? রোগ হইয়া যার জীবন যাইতে বসে, সে ভাল হইয়া উঠিলে এমনি ভাবে যখন কেহ তাহার চেহারা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, তখন অবিকল এমনি ভাবেই তো জবাব দিতে হয়! চেহারা কেন খারাপ হইয়াছে, উভয় পক্ষেরই যখন তাহা জানা থাকে, চেহারা সম্বন্ধে এই তো তখন বলা-বলির রীতি! অথচ আজ এই কথোপকথন তার এতগুলি আপনার জনের কানে গিয়া আঘাত করিয়াছে।

কারণটা গণপতি যেন বুঝিতে পারিল, রোগে যে রোগা হয়, চেহারা খারাপ হওয়ার অধিকার তাহার আছে, সেটা তার দোষ নয়। কিন্তু খুনের দায়ে জেলে গিয়া রোগা হইয়া আসিবার অধিকার এ জগতে কারো তো নাই—সে তো পাপের ফল,—অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া তার দুর্ব্বল দেহ ও পাংশু মুখ যে শুধু এই কথাটাই ঘোষণা করিতেছে,—অতি লজ্জাকর একটা খুনের দায়ে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছিল।

মাথাটা ঘুরিতেছিল, গণপতি একবার বিহ্বলের মত সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণে তাহার চোখ পড়িল রমার

দিকে। আর সকলে তাহার চারিদিকে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রমা কিন্তু কাছে আসে নাই, পাশের লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিবার দরজাটার আড়ালে সে পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া আছে,—অনেক দূরে···দীর্ঘ ব্যবধানে। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ব্যবধানটা যেন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, তারপর লুপ্ত হইয়া গেল অন্ধকারে।

বাড়ী ফিরিয়া পরিমলের সঙ্গে একটা কথা বলিয়াই গণপতি যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল—এতে কারো অবাক হওয়ার কারণ ছিল না। আহা, প্রায় ছমাস ধরিয়া বেচারা কি কম সহ্য করিয়াছে! কারাগারের পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে নিজের জীবন লইয়া ভাগ্যের লটারি খেলার অনিশ্চিত ফলাফলের প্রতীক্ষায় একাকী দিন কাটানো তো শুধু নয়,—বাহিরের অদৃশ্য জগতের কাছে ঘাড়-মোচড়ানো অফুরন্ত কাল্পনিক লজ্জা ভোগ-করাও তো শুধু নয়, গণপতি যে অনেকগুলি দিন ধরিয়া ফাঁসির দিনও গুণিয়াছে। ফাঁসি! ভাবিতে গেলেও নিরাপদ সহজ মানুষের দম আটকাইয়া আসে না? মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে বৈ কি গণপতি! অনেক আগেই তার দুবার মূর্চ্ছা যাওয়া উচিত ছিল। একবার যখন সে নিজের ফাঁসির হুকুম শোনে—আর একবার যখন সে জানিতে পারে, এ জীবনের মত ফাঁসিটা তাহার বাতিল হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য-রকম শক্ত মানুষ বলিয়াই না মূর্চ্ছাটা সে এতক্ষণ ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল!

সহ্যশক্তি রমারও কম নয়। আজ কতকাল সে খুনী-আসামীর বৌ হইয়া বাঁচিয়া আছে—অপাপবিদ্ধ পবিত্র মানুষের ঘরকন্নার

মধ্যে, পাড়ার একপাল ভদ্রমহিলার কৌতুক ও কৌতূহল মেশানো সহানুভূতির আকণ্ঠ আবর্ত্তে! কতদিন ধরিয়া সে অহোরাত্রি যাপন করিয়াছে—স্বামীর আগামী ফাঁসির তারিখের বৈধব্যকে ক্রমাগত বরণ করিয়া করিয়া! আপীল যদি না করা হইত—আজ রাত্রি প্রভাত হইলে কারো সাধ্য ছিল না রমাকে বৌ করিয়া রাখে। তবু এখনো লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিবার দরজার আড়ালে পাষাণ-প্রতিমার মত তাহার দাঁড়াইয়া থাকিবার ভঙ্গী দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। না আছে চোখে ভয়, না আছে দেহে শিহরণ! পাষাণ-প্রতিমার মতই তার কাঠিন্য যেন অকৃত্রিম। গণপতি যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল, তাতেও যেন তার কিছু আসিয়া গেল না। এক-পা আগানো দূরে থাক্ এক-পা পিছাইয়া লাইব্রেরী ঘরের ভিতরে আত্মগোপন করাটাই সে যেন ভাল মনে করিল। স্বামীর,—সত্যবানের মতই যে স্বামী তাঁহার—মৃত্যুর কবল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই স্বামীর মূর্চ্ছা ভাঙিবার কি আয়োজন হইল, একবার তাহা চাহিয়া দেখিবার সখটাও অন্ততঃ পক্ষে রমার গেল কোথায়? এ কৌতূহল যে মেয়েমানুষ দমন করিতে পারে—ধরিত্রীর মত তার সহ্যশক্তিও সত্যই অতুলনীয়—মৃত ও অসাড়।

মাথায় জল দিতে দিতে অল্পক্ষণ পরেই গণপতির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। জামা কাপড় বদলাইয়া একবাটি গরম দুধ খাইয়া সে সকলের সঙ্গে ভিতরের বড় ঘরে গিয়া বসিল। পশুপতি একবার প্রস্তাব করিয়াছিল যে, গণপতি নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করুক। গণপতি নিজেই তাহাতে রাজী হইল না।

মূর্চ্ছা ভাঙিবার পর নিজেকে লুকানোর ইচ্ছাটা কি কারণে যেন তাহার কমিয়া গিয়াছে ! অনেক জল ঢালার ফলে মাথাটা বোধহয় তাহার ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল সকলের সঙ্গে কথা বলিবার জন্ত এতক্ষণে সে একটু একটু আগ্রহই বরং বোধ করিতে লাগিল।

অল্পে অল্পে একথা-সেকথা হইতে হইতে কথাবার্ত্তা অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। ছ'মাসের মধ্যে আত্মীয়স্বজন অনেকের সঙ্গেই বহুবার গণপতির দেখা হইয়াছে, তবু সে এমনভাবে কথা বলিতে লাগিল, যেন ওই সময়কার পারিবারিক ইতিহাসটা ঘুণাক্ষরে জানিবার উপায়ও তাহার ছিল না। তিনমাস আগে জেলে বসিয়া পশুপতির কাছে বাড়ীর যে ঘটনার কথা শুনিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়াছিল, আজ পিসীমার মুখে সেই ঘটনার কথা শুনিয়া সে নবজাগ্রত বিস্ময় বোধ করিল, এমন কি—যে ব্যাপার এখানে সে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া জেলে গিয়াছিল—পরিমল তার বর্ণনা দিতে আরম্ভ করিলে, আজই যেন প্রথম শুনিতেছে এমনিভাবে শুনিয়া গেল। স্মৃতি, চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনা প্রভৃতি গণপতির ভিতরে কমবেশী জড়াইয়া গিয়াছে সত্য, তবু জানা কথা ভুলিবার মত অন্তমনস্কতা তো ফাঁসির আসামীরও আসিবার কথা নয়! কিন্তু এই অভিনয়ই গণপতির ভাল লাগিতেছিল। এমনই উৎসুকভাবে একথা-সেকথা জানিতে চাহিলে এবং তার জবাবে যে যা-ই বলুক গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাই শুনিয়া গেলে, ক্রমে ক্রমে তার নিজের ও অন্তান্ত সকলেরই যেন বিশ্বাস জন্মিয়া যাইবে দীর্ঘকালের জন্ত সে দূরদেশে বেড়াইতে গিয়াছিল। এতদিন তার গৃহে অনুপস্থিত থাকিবার আসল কারণটা সকলে ভুলিয়া যাইবে।

হয় ত তাই যাইতে লাগিল এবং সেই জন্য হয় ত যখন আবার ওই আসল কারণটা মনে পড়িবার অনিবার্য্য কারণ ঘটিতে লাগিল, সকলেই যেন তখন হঠাৎ একটু একটু চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। গণপতিকে পুলিশে ধরিবার অল্প কিছুদিন আগে মহাসমারোহে তার ছোটবোন রেণুর বিবাহ হইয়াছিল। গণপতি একসময় রেণুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে সকলের এমনি সচকিতভাব দেখা গেল! এ ওর মুখের দিকে চাহিল—কিন্তু বয়স্ক কেহ জবাব দিল না। শুধু পশুপতির সাতবছরের মেয়ে মায়া বলিল, পিসীমাকে শ্বশুরবাড়ীতে রোজ মারে, কাকা।

গণপতি অবাক্ হইয়া বলিল, মারে?

মায়া বলিল, তুমি মানুষ মেরেছ কি-না তাই জন্যে।

তিন চার জন একসঙ্গে ধমক দিতে মায়া সভয়ে চুপ করিয়া গেল। মনে হইল, ধমকটা যেন গণপতিকেই দেওয়া হইয়াছে। কারণ, মায়ার চেয়েও তার মুখখানা শুকাইয়া গেল বেশী। আবার কিছুক্ষণ এখন তাহার কারো মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার ক্ষমতা হইবে না।

পশুপতি গলা সাফ করিল। বলিল, ঠিক যে মারে তা নয়। তবে ওরা ব্যবহারটা ভাল করছে না।

বড় বোন বেণু বলিল, বিয়ের পর সেই যে নিয়ে গেল মেয়েটাকে এ পর্য্যন্ত আর একবারও পাঠায়নি। মহী দু'বার আনতে গেছলো।

মহীপতি বলিল, 'আমার সঙ্গে একবার দেখা করতেও দেয় নি। বল্লে—'

রাজেন্দ্রনাথ কাঁপা গলায় বলিলেন, আহা, থাকনা ও-সব কথা,

বাড়ীতে ঢুকতে না-ঢুকতে ওকে ও-সব শোনাবার দরকার কি! ও তো আর পালিয়ে যাবে না!

খানিকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিল। বাহিরে বাদল মাঝখানে একটু কমিয়াছিল, এখন আবার আরও জোরের সঙ্গে বর্ষণ সুরু হইয়াছে। ঘরের মধ্যেও এখন ভিজা বাতাসের গাঢ়তম স্পর্শ মেলে। রমা এবারও ঘরে আসে নাই, এবারও সে নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে—পাশের ঘরের দরজার ওদিকে। তবে এবার আর সে দাঁড়াইয়া নাই, মেঝেতে বসিয়াছে। একতলার রান্নাঘর হইতে ডাল সম্ভারের গন্ধ ভিজা বাতাসকে আশ্রয় করিয়া আসিয়া এঘরে জমা হইয়াছে, বেণুর বড় মেয়ে সৌখীন সুহাসের অঙ্গ হইতে এসেন্সের যে গন্ধ এতক্ষণ পাওয়া যাইতেছিল তাও গিয়াছে চাকিয়া। পিসীমা কয়েক মিনিটের জন্য ঠাকুর ঘরে গিয়াছিলেন, প্রসাদ ও প্রসাদী ফুলের রেকাবি হাতে তিনি এই সময় ফিরিয়া আসিলেন। সকলের আগে গণপতিকে বলিলেন, জুতো থেকে পা টা খোল তো বাবা।

জুতার স্পর্শ ত্যাগ করিয়া গণপতি পবিত্র হইলে, পিসীমা প্রসাদী ফুল লইয়া তাহার কপালে ঠেকাইলেন, তার পর হাতে দিলেন প্রসাদ এবং আজও আধা-মমতা আধা-ধমকের সুরে তাহার চিরন্তন অনুযোগটা শুনাইয়া দিলেন—ঠাকুরদেবতা কিছু তো মানবি নে, শুধু অনাচার করে বেড়াবি।

এঘরে কেহ কিছু বলিল না; কিন্তু পাশের ঘরের দরজার ওদিক হইতে অস্ফুট কণ্ঠে শোনা গেল, মাগো!

পিসীমা চমকাইয়া বলিলেন, কে গো ওখানে, বৌমা?

পরিমল জিজ্ঞাসা করিল,—কি হল রে, রমা ?

রমার আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। পরিমলের কোলের ছেলেটি মেঝেতে হামা দিতে দিতে নাগালের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, গণপতি হাত বাড়াইয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইল—ওকে আদর করিবার ছলে মাথা হেঁট করিয়া থাকা সহজ। রাজেন্দ্রনাথ কাঁপা গলায় বলিলেন, ভাখ্ তো সুহাস, মেজ-বৌমার কি হ'ল ? ফিট্-টিট্ হ'ল নাকি ?

পরিমল বলিল, তুই বোস্ আমি দেখছি।

উঠিয়া গিয়া নীচুগলায় রমাকে কি যেন জিজ্ঞাসা-বাদ করিয়া সে ফিরিয়া আসিল বলিল, না, কিছু হয় নি।

—কিছু না। একেবারেই কিছু হয় নাই। কি হইবে ওই পাথরের মত শক্ত মেয়েমানুষটার ? এই যে এতকাল গণপতি জেলখানায় আটক ছিল, ফাঁসি-এড়ানোর ভরসা কয়েকদিন আগেও তাহার ছিল না,—রমা কি একদিন আবেগে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ননদ, জা কারো বুকে একবার আশ্রয় খুঁজিয়াছিল, কারোকে টের পাইতে দিয়াছিল—তার কিছুমাত্র সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে ? একথা সত্য যে, যেদিন হইতে গণপতিকে পুলিশে ধরিয়াছিল, সেদিন হইতে সে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, দিনের পর দিন কথা কমাইয়া কমাইয়া প্রায় বোবা হইয়া গিয়াছে, রোগা হইতে হইতে সোণার বরণ তাহার হইয়া গিয়াছে কালী ! তা, সেটা আর এমন কি বেশী ! দুঃখের ভাগ তো সে দেই নাই, সান্ত্বনা তো নেয় নাই, লুটাইয়া বুকফাটা কান্না তো কাঁদে নাই !

একদিন বুঝি কাঁদিয়াছিল। শুধু একদিন!

গভীর রাত্রে বাড়ীর সকলে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—সুহাস ছাড়া। সেদিন সুহাসের বর আসিয়াছিল, তাই বর বৌ দুজনেরই হইয়াছিল অনিদ্রা-রোগ। অত রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া দু'জনে হাত ধরাধরি করিয়া রমার ঘরের সামনে দিয়া তাদের কোথায় যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল—সে কথা বলা মিছে। নিজের ঘরে রমা একা থাকিত, এখনো তাই থাকে। অনেক বলিয়া—অনেক বকিয়াও তা'কে কারো সঙ্গে শুইতে রাজী করা যায় নাই। এমন কি শ্বশুরের অনুরোধেও না।

যাই হোক, রমার ঘরের সামনে সুহাস থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কান পাতিয়া ঘরের মধ্যে বিশ্রী একটা গোঙানির আওয়াজ শুনিয়া ভয়ে বেচারীর স্বামী-সোহাগে তাতানো দেহটা হইয়া গিয়াছিল হিম। বরকে ঘরে পাঠাইয়া,তার পর সে ডাকিয়া তুলিয়াছিল—পরিমলকে; বলিয়াছিল, বড়মামী, ঘরের মধ্যে মেজমামী গোঙাচ্ছে, শীগগির এসো।

—গোঙাচ্ছে? ডাক্ ডাক্ তোর মামাকে ডেকে তোল, সুহাস।—কি হবে মা গো!

পশুপতিকে পিছনে করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া পরিমল খানিকক্ষণ রুদ্ধ দরজায় কান পাতিয়া রমার গোঙানি শুনিয়াছিল। তারপর জোরে জোরে দরজা ঠেলিয়া ডাকিয়াছিল, মেজ-বৌ! ও মেজ-বৌ, শীগগির দরজা খোল।

প্রথম ডাকেই গোঙানি থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তারপর অনেক ডাকাডাকিতেও রমা প্রথমে সাড়া দেয় নাই। শেষে ধরা গলায় বলিয়াছিল,—কে?

—আমি। দরজা খোল তো মেজ-বৌ, শীগগির।

—কেন দিদি?

পরিমল অবশ্য সে কৈফিয়ৎ দেয় নাই, আরও জোরে ধমক দিয়া আবার দরজাই খুলিতে বলিয়াছিল। রমারও আর দরজা না খুলিয়া উপায় থাকে নাই।

—কি হয়েছে দিদি?

—তুই গোঙাচ্ছিলি কেন রে, মেজ-বৌ?

রমা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিয়াছিল, গোঙাচ্ছিলাম? কে বললে?

বারান্দার আলোয় রমার মুখে চোখের জলের দাগগুলি স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল। একটু থামিয়া ঢোঁক গিলিয়া পরিমল বলিয়াছিল—'আমি নিজে শুনেছি, তুই তবে কাঁদছিলি?'

—না কাঁদিনি তো! কে বললে কাঁদছিলাম?—বলিয়া পশুপতির দিকে নজর পড়ায় রমা লম্বা ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল।

তখন পরিমল বলিয়াছিল, আমি আজ তোর ঘরে শোব রমা?—

রমা বলিয়াছিল,—কেন?

কি কৈফিয়তই যে মেয়েটা দাবী করিতে জানে!—অফুরন্ত!

পরিমল ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিল,—ভয়টয় যদি পাস—

রমা বলিয়াছিল,—ভয় পাব কেন? আমার অত ভয় নেই,… বড্ড ঘুম পাচ্ছে দিদি।

বলিয়া সকলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কি রূঢ় ব্যবহার! মনে করলে আজও পরিমলের গা জ্বালা করে।

যাই হোক তার পর হইতে রাত্রে বাহিরে গেলে বাড়ীর অনেকেই চুপি চুপি রমার ঘরের দরজায় কান পাতিয়া ভিতরের শব্দ শুনিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আর কোনদিন কিছু শোনা যায় নাই।

শোনা যাইবে কি, রমা কি সহজ মেয়ে! হোক না স্বামীর ফাঁসি, সে দিব্যি মস্ত একটা ঘরে সারারাত একা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে পারে। আজ হঠাৎ অস্ফুটস্বরে একবার 'মাগো' বলিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই ওর যে কিছু হইয়াছে—এ-কথা মনে করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

মিষ্টার দে'র কড়া সিগার টানিয়া পশুপতির বোধ হয় গলাটা খুস খুস করিতেছিল, সে আর একবার গলা সাফ করিয়া বলিল, রেণুর জন্যে তুমি ভেবো না গণু। ওকে আসতে দেয়নি বটে, কিন্তু ওকে কষ্ট ওরা দেয় না।

বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী গিয়া আর আসিতে না দিলে, ষোল বছরের মেয়েকে কষ্ট দেওয়া হয় কি না, গণপতি ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না; কিন্তু বোনটার জন্য তার নিজের বড় কষ্ট হইতে লাগিল! মৃদুস্বরে সে বলিল, 'ওকে একটা তার করে দিলে হ'ত না?

পশুপতি বলিল,—তোমার কথা? থাকগে, কাজ নেই, কি আর হবে ওতে? মাঝখান থেকে বাড়ীর লোকে হয় ত অসন্তুষ্ট হবে। কাল খবরের কাগজেই সব পড়তে পারবে।

খবরের কাগজ? তা ঠিক, খবরের কাগজে কাল সব খবরই বাহির হইবে বটে। কিন্তু রেণু কি খবরের কাগজ পড়িতে পায়?

ভাই খুনের দায়ে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া অতটুকু মেয়েকে যারা আটক করিয়া রাখিতে পারে—এতখানি উদারতা কি তাদের হওয়া সম্ভব ? গণপতি পরিমলের ছেলেকে মেঝেতে নামাইয়া দিয়া বলিল, তবু আপীলের ফলটা আগে থাকতে জানতে পারলে—

রাজেন্দ্র বলিলেন, তাই বরং দাও পশু, রেণুর শ্বশুরকে একটা তার করে' দাও। লিখে দিও 'প্লিজ ইনফর্ম রেণু'—নয় ত সে ব্যাটা হয় ত মেয়েটাকে কিছু জানাবে না।

তার লিখিতে পশুপতি আপিস ঘরে গেল।

মানুষের মধ্যে খোঁজ করিলে সব সময়েই মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পাশবিকতা দিয়া হোক, দেবত্ব দিয়া হোক, কে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া রাখিতে পারে ? বত্রিশ বছর যে পরিবারে গণপতি সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন করিয়াছে, আজ সেখানে একটা বীভৎস অসাধারণত্ব অর্জ্জন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে যে বিশেষভাবে অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠিবে এবং এতগুলি মানুষের মধ্যে ক্রমাগত মানুষকে খুঁজিয়া পাইতে থাকিবে—তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। পলকে পলকে সে টের পাইতে লাগিল, এরা ভুলিতে পারিতেছে না। বিচার নয়, বিশ্লেষণ নয়, বিরাগ অথবা ক্ষমাও নয়, শুধু স্মরণ করিয়া রাখা—স্মরণ করিয়া রাখা যে, তাদের এই গণপতির অকথ্য কলঙ্ক রটিয়াছে, দেশের ও দশের কাছে সে পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দিয়াছে। আইনের আদালতে ভালরকম প্রমাণ না হোক, মানুষের আদালতে তার পাশবিকতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ফাঁসির হুকুম রদ হোক, এ ব্যাপারের

এইখানে শেষ নয়, এখনও অনেক বাকী,—অনেক মন ও মানের লড়াই! প্রত্যেকের ভিতরের মানুষটি এই অনিবার্য্য ক্ষতি ও বিপদের চিন্তায় ভীত ও বিমর্ষ হইয়া আছে, এই যে মানুষ, ভিতরের মানুষ, এ বড় দুর্ব্বল, বড় স্বার্থপর—তাই একথাটাও কে না ভাবিয়া থাকিতে পারিয়াছে যে, এর চেয়ে ফাঁসি হইয়া গেলেই অনেক সহজে সব চুকিয়া যাইতে পারিত! যে নাই, কতকাল কে তার কলঙ্ককাহিনী মনে করিয়া রাখে? মনে করিয়া রাখিলেই বা কি? গণপতি না থাকিলে, এ বাড়ীতে কেন তার কলঙ্কের ছায়াপাত হইবে? সেটা নিয়ম নয়। লোকে শুধু এই পর্য্যন্ত ভাবিতে পারিত যে, এ বাড়ীতে একটা বদলোক থাকিত, যে একটা স্ত্রীলোক ঘটিত অপরাধে জড়িত হইয়া একটা মানুষ খুন করিয়া ফেলিয়াছিল—কিন্তু সে লোকটা এখন আর নাই, এই বাড়ীর আবহাওয়া এখন আবার পবিত্র, এ বাড়ীর মানুষগুলি ভাল।

আর তা হইবার নয়! দুষ্ট মানুষ ঘরে আসিযাছে, তার দোষে ঘরের আবহাওযা দুষিত হইয়াছে, দুষিত আবহাওয়া মানুষগুলিকে করিয়াছে মন্দ! অন্ততঃ লোকে তো তা-ই ভাবিবে।

এত স্পষ্টভাবে না হোক্, মোটামুটি এই চিন্তাগুলিই গণপতির অনুসন্ধান তার মনে আনিয়া দিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সহসা রমার জন্ত তার মনে দেখা দিল—গভীর মমতা! জেলে বসিয়া রমার কথা ভাবিযা তার খুব কষ্ট হইত, কিন্তু সে ছিল শুধু তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া—রমা যে যাতনা ভোগ করিতেছে, তাই ভাবার কষ্ট! কিন্তু এখন হঠাৎ সে বুঝিতে পারিল, স্বামীর জন্ত শুধু ভাবিয়াই রমা রেহাই পায় নাই, নিজের অন্ধকার

ভবিষ্যৎটার পীড়ন সহিয়াই তার মহাশক্তির পরীক্ষা শেষ হয় নাই, আরও অনেক কিছু জুটিয়াছে। বাহিরের জগত নরঘাতকের স্ত্রীকে যা দেয়! সে সব যে কি এবং সে সব সহ্য করিতে একটি নিরুপায় ভীরু বধূর যে কতখানি কষ্ট হইতে পারে—ধারণা করিবার মত কল্পনাশক্তি গণপতির ছিল না। যেটুকু সে অনুমান করিতে পারিল—তাতেই বুকের ভিতরটা তাহার তোলপাড় করিতে লাগিল।

নিজেকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, যাক্, রমার একটা প্রকাণ্ড দুর্ভাবনা তো দূর হইয়াছে! স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়া আজ তো মনে তার আনন্দের বান ডাকিয়াছে! এতদিন সে যদি অকথ্য দুঃখ পাইয়াই থাকে—আজ আর সে-কথা ভাবিয়া লাভ কি? প্রতিকারের উপায়ও তাহার হাতে ছিল না যে, রমার দুঃখ কমানোর চেষ্টা না-করার জন্য আজ আপশোষ করিলে চলিবে। জেলে বসিয়া রমার দুঃখটা 'সে ঠিক মত পরিমাপ করিতে পারে নাই; অন্যায় যদি কিছু হইয়া থাকে—তা শুধু এই। তা এ অন্যায়ের জন্য রমার আর কি আসিয়া গিয়াছে! সে বুঝিলেই তো রমার দুঃখ কমিত না।

রাত্রি ন'টার সময় বৃষ্টি বন্ধ হইলে, পাড়ার দু'একজন ভদ্রলোক এবং পাড়ার বাহিরের দু'চার জন বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিলেন। পশুপতির ইচ্ছা ছিল, গণপতি আজ কারো সঙ্গে দেখা না-করে—সে-ই সকলকে বলিয়া দেয় যে, গণপতির শরীর খুব খারাপ সে শুইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গণপতি একথা কানে তুলিল না, নীচে গিয়া সকলের সঙ্গে দেখা ও বসিয়া আলাপ

করিল। রমার কথা নূতন ভাবে ভাবিতে আরম্ভ করিবার পর গণপতি নিজের মধ্যে একটা নূতন তেজের আবির্ভাব অনুভব করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল, যা-ই ঘটিয়া থাক, ভীরু ও দুর্ব্বলের মত হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না; নিজের জোরে আবার তাহাকে নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভূমিকম্পে বাড়ী অল্পবিস্তর জখম হইয়াছে বলিয়া মাঠে বাস করিলে তো তাহার চলিবে না? বাড়ীটা আবার মেরামত করিয়া লইতে হইবে। লজ্জায় সে যদি এখন মুখ লুকায়, তার লজ্জার কারণটা যে লোকে আরও বেশী সত্য বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিবে, আরও বড় বলিয়া ভাবিতে থাকিবে।

যাঁরা আসিয়াছিলেন, গণপতির মুক্তিতে আনন্দ জানানোর ছলে কৌতূহল মিটাইতেই তাদের আগমন। গণপতির সঙ্গে কথা বলিয়া সকলে একটু অবাক্ হইয়াই বাড়ী গেলেন। মানুষটা ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু খুব যে নীচে নামিয়াছে —কারো তা মনে হইল না। সে নিজেই এক রকম চেষ্টা করিয়া প্রথম আলাপের আড়ষ্টতা কাটাইয়া আনিল। বেশী বকিল না, বেশী গম্ভীর হইয়া থাকিল না, গোঁয়ারের মত ফাঁসির হুকুম পাওয়ার ব্যাপারটাকে অবহেলা করিয়া একেবারে উড়াইয়াও দিল না, আবার এমন ভাবও দেখাইল না যে, ফাঁসির হাত এড়ানোর আনন্দে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে! ভগবান তো আছেন, বিনা দোষে একজনকে তিনি কি শাস্তি দিতে পারেন?—এমন আশ্চর্য্য সরলতার সঙ্গে এমন ভাবে গণপতি একবার এই কথাগুলি বলিল

যে, শ্রোতাদের মনে তার প্রতি সত্য সত্যই একটু শ্রদ্ধার ভাব দেখা দিল, মনে হইল—আসিবার সময় লোকটার সম্বন্ধে যে ধারণা তাদের ছিল, লোকটা হয় ত সত্যই অতটা খারাপ নয়।

আগন্তুকদের মধ্যে এই পরিবর্ত্তনটুকু টের পাইতে গণপতির বাকী রহিল না। জয়ের গর্ব্বে ও আশার আনন্দে তার বুক ভরিয়া গেল। এবার তাহার বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, সে পারিবে, তার ভাঙ্গা মান-সম্ভ্রমকে আবার সে নিটোল করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে। তার নামে চারিদিকে যে ছি-ছি শব্দ পড়িয়া গিয়াছে—ক্রমে ক্রমে একদিন সে শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়া একেবারে মিলাইয়া যাইবে। তার সম্বন্ধে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাব মরিয়া গিয়া মানুষের মনে আবার জাগিয়া উঠিবে প্রীতি ও শ্রদ্ধা—মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে আর তার কোন অসুবিধা থাকিবে না।

রাত্রি বাড়িয়া যাইতেছিল, বাহিরের সকলে চলিয়া গেলে, গণপতি আর বেশী দেরী না করিয়া সামান্য কিছু খাইয়া নিজের ঘরে শুইতে গেল। নবজীবনের সূচনা করিতে বাহিরের কয়েকটি লোকের কাছে খানিক আগে সে যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তখনও তার মন হইতে তার মাদকতাভরা মোহ কাটিয়া যায় নাই এবং খানিক পরে সেই জন্যই রমার সঙ্গে তার বাধিল বিবাদ।

বিবাদ? এমন প্র[illegible] পর রমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার রাত্রে—বিবাদ? হয় ত ঠিক তা নয়; কিন্তু রমা ঘরে আসিবার ঘণ্টাখানেক পরে দুজনের মধ্যে যে সব কথার আদান প্রদান হইল, সেগুলি বিবাদের মতই একটা কিছু হইবে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার সাহস দু'জনের কাহারো ছিল না। ঘরে ঢুকিয়া রমা তাই যেমন ধীর পদে তার কাছে আসিল—সেও তেমনি ধীরভাবেই তাহাকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করিল। রমার ওজন অর্দ্ধেক হাল্কা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গণপতি সেটা ভাল রকম টের পাইল না। তার গায়ের জোরও যে অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে!

রমার দুচোখ দিয়া আস্তে আস্তে জলের ফোঁটা নামিতেছিল। খানিকক্ষণ পরে সে বলিল, তোমায় ফিরে পাব, ভাবি নি।

গণপতি তার মাথাটা কাঁধের পাশে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমিও ভাবি নি আবার এ-ঘরে তোমার কাছে ফিরে আসতে পাব।

শুধু রমার কাছে নয়, এ-ঘরে রমার কাছে ফিরিয়া আসিবার সাধ! রমাকে দেখিবার ফাঁকে ফাঁকে এখনো গণপতি ঘরখানাকেও দেখিতেছিল। প্রায় কিছুই বদলায় নাই ঘরের! বাগানের দিকে দু'টি জানালার কাছে, যে-খানে যে-ভাবে খাট পাতা ছিল—আজও সেইখানে তেমনি ভাবে পাতা আছে। ও-কোণে দেওয়ালে বসানো আলোটার ঠিক নীচে রমার প্রসাধনের টেবিল,—ছ'মাস কি সে প্রসাধন করিয়াছিল? এখানে খাটে বসিয়া আজও আয়নাটাতে তাদের প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে: রমা আগে মাঝে মাঝে কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, ওরা কে গো? আমাদের দেখ্ছে না-তো? দেওয়ালে তাদের বিবাহের বেশে তোলা ফটো এবং এ-বাড়ীর ও রমার বাড়ীর কয়েকজনের ফটো টাঙ্গানো আছে। কেবল পুরাণো যে তিনটি দামী ক্যালেণ্ডার ছিল তার একটির বদলে

আসিয়াছে দু'টি সাধারণ ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। তার অনুপস্থিতির সময়ের মধ্যে একটা বছর কাবার হইয়া গিয়া নতুন একটা বছর যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে! আরও একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে ঘরের। ঘরের ঔজ্জ্বল্য কমিয়া গিয়াছে। মেঝেটা সে রকম ঝক্-ঝকে নয়, ফটো আর ছবিগুলিতে অল্প অল্প ধূলা আর ঝুল পড়িয়াছে, চারিদিকে আরও যেন আসিয়া জুটিয়াছে কত অদৃশ্য মলিনতা।

কি দেখছ?—রমা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল। প্রায় একঘণ্টা পরে।

গণপতি বলিল, ঘর দেখছি।

রমা বলিল, ঘর দেখে আর কি হবে? এ ঘরে তো আমরা থাকব না।

—থাকব না? কোন ঘরে যাব তবে?

—আমরা চলে যাব।

রমা বিছানায় নামিয়া একটু সরিয়া ভাল করিয়া বসিল। বিবাদ সুরু হইয়া গিয়াছে।

গণপতি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল,—কোথায় চলে যাব রমা?···

অনেক বিনিদ্র রাত্রি ব্যাপিয়া রমা এ প্রশ্নের জবাব ভাবিয়া রাখিয়াছে, সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, যে দিকে দু'চোখ যায়,—অনেকদূর অচেনা দেশে, কেউ যেখানে আমাদের চেনে না, নাম-ধাম জানে না—সেখানে গিয়ে আমরা বাসা বাঁধব। আজ রাত্রেই সব বেঁধে-ছেঁদে রাখি, কাল সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব, কেমন? আর একটা দিনও আমি এখানে থাকতে পারব না।

গণপতি বোকার মত জিজ্ঞাসা করিল,—কেন ?...

রমা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'বুঝতে পারছ না ? সবাই আমাদের ঘেন্না করবে—আমরা এখানে থাকব কি করে ?'

এমনিভাবে সুরু হইল তাহাদের কথা-কাটাকাটি। গণপতি বলিল যে, এমন পাগলের মত কি কথা বলিতে আছে, বাড়ী-ঘর আত্মীয়-স্বজন অর্থোপার্জ্জন সব ফেলিয়া গেলেই কি চলে ? কি-ই বা দরকার যাওয়ার ? দু'চারদিন লোকে হয় ত একটু কেমন কেমন ব্যবহার করিতে পারে, তারপর সব ঠিক হইয়া যাইবে। এত ভাবিতেছে কেন রমা ? বিবাদ করার মত করিয়া নয়, আদর করিয়া—খুব মিষ্টি ভাষাতেই গণপতি তাহাকে কথাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাহিরের ঘরে, বাহিরের কয়েকটি লোকের মন হইতে অশ্রদ্ধার ভাব সে যে মোটে আধঘণ্টার চেষ্টাতে প্রায় দূর করিয়া দিয়াছিল, একথা গণপতি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। দেশ ছাড়িয়া চিরদিনের জন্য বহুদূরদেশে—অজানা লোকের মাঝে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার ইচ্ছাটা রমার, তাই তার মনে হইতেছিল ছেলেমানুষী।

রমা শেষে হতাশ হইয়া বলিল,—যাবে না ?

গণপতি তাহাকে বুকে টানিয়া আনিল, সস্নেহে তাহার পাংশু কপোলে চুম্বন করিয়া বলিল,—যাব না বলেছি, পাগলি ? চল না দু'জনে দু'চার মাসের জন্য কোথা থেকে বেড়িয়ে আসি।

রমা অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, দু'চার মাসের জন্য আমি কোথাও যাব না। চিরদিনের জন্যে।

—আচ্ছা, কাল এসব কথা হবে রমা।

—না, আজকে বল যাবে কি না, এখুনি বল। কাল ভোরে উঠে আমরা চলে যাব।

গণপতি এবার হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—'আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে বলত? এমন করে কেউ কখনো যায়?' রমা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'আচ্ছা, তবে থাক।'

গণপতি আরও খানিকক্ষণ তাহাকে আদর করিল, আরও খানিকক্ষণ বুঝাইল। কিন্তু দুর্ব্বল শরীরটা তাহার শ্রান্তিতে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তাই আধঘণ্টাখানেক পরে ছেলেমানুষ বৌকে আদর করা ও বোঝান দু'টাই যথেষ্ট হইয়াছে, মনে করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে রাজেন্দ্র উকীলের বাড়ীতে একটা বিরাট হৈ-চৈ শোনা গেল। বাড়ীর মেজবৌ রমা নাকি গলায় ফাঁসি দিয়া মরিয়াছে।

ভূমিকম্প

মাঝরাত্রে বাসুকী একবার মাথা নাড়িলেন।

প্রসন্ন অঘোরে ঘুমাইতেছিল। কাল গরমে তাহার ভাল ঘুম হয় নাই, আজ ন'টা বাজিতে-না-বাজিতে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। খাইয়া উঠিয়া দশ মিনিট কালও সে আজ বসিতে পারে নাই। অমন চাঁদ উঠিয়াছিল আজ, টুক্‌রা টুক্‌রা গতিশীল মেঘে অমন অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল আকাশ, ওদিকে তাকাইবার অবসরও তাহার ছিল না। চোখে ঘুম লইয়া সে শুইয়াছিল এবং শোয়ামাত্র ঘুমাইয়াছিল।

তারপর মাঝরাত্রে প্রকৃতির এই কাণ্ড।

প্রসন্নের ঘুম ভাঙিল আতঙ্কে। তখন চাঁদ অস্ত গিয়াছে, ঘরের ভিতর অন্ধকার এমন গাঢ় যে চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না। চৌকীটা বেতালে দুলিতেছে, টিনের চালে ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ উঠিয়াছে, বাহিরের আকাশ শঙ্খের আর্ত্তনাদে মুখর। কোণ ছিঁড়িয়া মশারির একটা দিক্‌ গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া বুঝিবার জো নাই যে এই কোমল অবাধ্য আলিঙ্গন মশারিরই, একটা নাম-না-জানা ভয়ানক কোন কিছুর নয়।

প্রসন্নের মনে হইল, সে মরিয়া গিয়াছে। ভয়ের এতগুলি সমন্বয় মানুষের জীবনে বাঁচিয়া থাকিতে ঘটে না।

হঠাৎ প্রসন্ন সচেতন হইয়া উঠিল, কে যেন উঠানে তারস্বরে হাঁকিতেছে, 'প্রসন্ন ওঠ্‌ শিগগির, ভূমিকম্প হচ্ছে। ওরে প্রসন্ন, প্রসন্ন ?'

ভয়ের মধ্যে পলায়নের প্রেরণা থাকে, কত যুগযুগান্ত ধরিয়া যে ভয়ের আগে আগে সে পলাইয়া বেড়াইতেছিল তাহার ঠিকানা নাই,

কিছু না জানিয়া কিছু না বুঝিয়া ও-ভাবে পলানোর মত ভয়ানক আর কিছু নাই, এবার প্রসন্ন বাঁচিল। মশারির আলিঙ্গন ছাড়াইয়া সে চৌকির নীচে নামিয়া পড়িল।

কিন্তু পলাইতে আরম্ভ করার মধ্যে যে পরিত্রাণ নাই সে কথা বোঝা গেল মুহূর্ত্তের মধ্যেই। প্রসন্ন দরজা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার ধারণা মত যেখানে দরজা থাকার কথা সেখানটা হাতড়াইয়া শুধু দড়মার বেড়াই তাহার হাতে ঠেকিল। আজ এই একান্ত অসময়ে সে দরজার অবস্থান ভুলিয়া গিয়াছে। এ কি অসহায় অবস্থা!

ভূমিকম্পের চেয়ে হৃদ্‌কম্পই এবার তাহার বড় বিপদ হইয়া উঠিল। মাটির সঙ্গে কাঁপিতে গিয়া সাজানো ইটের বাড়ী যেভাবে ভাঙিতে থাকে প্রসন্ন তেমনি ভাবে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। নাড়া খাইয়া তাহার মগ্ন চেতনা হইতে যে কত দুঃখ ভয় ও উত্তেজনার তলানি উঠিয়া আসিয়া তাহার বর্ত্তমান আতঙ্কের সঙ্গে মিশিয়া গেল তাহার হিসাব হয় না।

বাহিরে শঙ্খের শব্দ, হুলুধ্বনি ও আত্মীয়স্বজনের ব্যাকুল ডাকাডাকির বিরাম নাই। পৃথিবীর যেখানে যত মমতা আছে, সব যেন তাহার বিপদে একসঙ্গে আপ্‌শোষ জুড়িয়া দিয়াছে, সে বাহির হইতে না পারিলে শেষ পর্য্যন্ত ওদের বুকও তাহার বুকের মতই ভাঙিয়া যাইবে।

'দরজা কই, দরজা?'

'এইখানে দরজা, এইখানে—' মার হাতের বালা ঠকাঠক্ শব্দে দরজায় মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

প্রসন্ন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। বাঁচিবার অনন্ত অবকাশ লইয়া উঠানের কোণে ভাঙা চৌকীটাতে সে বসিয়া পড়িল। এই রুক্ষ কঠোর মাটির পৃথিবীর সঙ্গে অসমান যুদ্ধে সে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে দারুণ আহত।

সেই ভূমিকম্পের পর প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত প্রসন্নের মস্তিষ্কে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলে, অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ কেহ জোরে নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহার মাথার মধ্যে একটা কালো পর্দ্দা দুলিতে আরম্ভ করে। পর্দ্দাটিব প্রান্তগুলি পরল পরল অন্ধকার দিয়া দড়মার বেড়ার মত করিয়া বোনা এবং ঝাপ্সা অন্ধকারের দেয়ালে আটকানো। দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া জোরে জোরে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়া পর্দ্দা সরানো যায় না, অতীত-জীবনের চেনা অথচ অজানা রহস্যের মত দুলিতে থাকে। চেষ্টা স্থগিত করিলে হঠাৎ এক সময় পর্দ্দাটা অন্তর্হিত হইয়া যায়। আশ্চর্য্য এই, তখন আর পর্দ্দাটির ভূতপূর্ব্ব অস্তিত্বে প্রসন্ন বিশ্বাস করে না। মাথার মধ্যে যে মাঝে মাঝে তাহার অমন খাপছাড়া অভিনয় হয় সে কথাটাও সে বেশ ভুলিয়া থাকে।

বছর দুই পরে চাকরির চেষ্টায় একবার মাদ্রাজ ঘুরিয়া আসিয়া পর্দ্দাটা তাহার মাথা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রাখিয়া গেল অন্য উপসর্গ।

মাদ্রাজ যাওয়ার সময় তাহার সঙ্গে একটি স্যুটকেসে খান-দুই ধুতি ও একটি জামা ছিল, ওই সামান্য জিনিস চুরি যাওয়ার ভয়ে সমস্ত পথ সে চোখ বুজিতে পারে নাই। রূপান্তর লইয়া এই ভয়

তাহার মনে কায়েমী হইয়া রহিল। প্রত্যেক রাত্রে সমস্ত রাত্রির জন্য নিজের অচেতন অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া তাহার ঘুম টুটিয়া যাইতে লাগিল। কৌতূহলের ছোট বড় সমস্ত বিষয় ঘুমের রহস্যের মতই তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। যাহা গোপন, যাহা সে বোঝে না তাহাই ভয়ানক, তাহাই নিষ্ঠুর। একদিন ছেলেদের পুরাণো মাসিকে একটা সামান্য ধাঁধাঁর জবাব বাহির করিতে না পারিয়া ক্রোধে ক্ষোভে সে এমন বিচলিত হইয়া পড়িল যে, পরে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করিয়া দেখিয়া তাহার দুঃখ ও লজ্জার সীমা রহিল না।

তখন দিনের আলো নিবিয়া আসিয়াছে, চারিদিকে আনন্দের দীনতা। কপালের ঘাম বাতাসেই শুকাইয়াছে, তথাপি কাপড় দিয়া কপাল মুছিয়া প্রসন্ন ভাবিতে লাগিল, সে যে পাগল নয় তার প্রমাণের সংখ্যাগুলি যদি এমনি ভাবে কমিয়া আসে তাহা হইলে উপায় হইবে কি ?

অথচ প্রতিকার নাই। সে সবই বুঝিতে পারে, কিন্তু নিজেকে কিছুই বুঝাইতে পারে না। রাত্রে মশারি গুঁজিয়া শুইয়া তাহার মনে হয় ভাল করিয়া বুঝি গোঁজা হয় নাই, কোথায় ফাঁক রহিয়াছে, মশা ঢুকিবে। এ যে ভুল বুঝিতে পারিলেও তিন চার বার সন্তর্পণে তোষকের চারিপ্রান্ত না হাতড়াইলে তাহার স্বস্তি থাকে না। বসিবার ঘরে তালা দিয়া বার-বার টানিয়া দেখিয়া আসিলেও তাহাকে আবার ফিরিয়া গিয়া তালা ঠিকমত লাগানো সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়। চৌকীর নীচে রোজই সে চোর খোঁজে।

এমনি সব অন্তহীন পাগলামী। মাঝে মাঝে সে বিদ্রোহ করে,

কিন্তু তাহাতে ফল আরও খারাপ হয়। যুদ্ধ করিয়া হার মানিতে জ্বালা যেন বাড়িয়া যায়। নিজের কাছে নিজের সে কি নির্ম্মম অপমান!

প্রসন্নের হৃদয়বৃত্তিগুলি ক্রমে তীক্ষ্ণ ও সতেজ হইয়া উঠিল, অনুভবশক্তি আশ্চর্য্যরকম বাড়িয়া গেল;—তাহার মধ্যে ভাবপ্রবণতা দেখা দিল। ছোট দুঃখ তাহার কাছে এখন আর ছোট নয়, প্রাত্যহিক জীবনের যে-সব সূক্ষ্ম ও কোমল সুর তাহার মত অকবির কানে পশিবার কথা নয় এখন সেগুলি সে বেশ ধরিতে পারে। কল্পনাকে,—অবাস্তব কল্পনাকে, আমল দিতে তাহার ভাল লাগে।

সময় সময় সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়ে। জীবনের দেনা-পাওনার কড়া হিসাবী সে নয়, তবু সে টের পায় জীবনটা অর্থহীন। বাঁচিয়া থাকার কোন মানেই সে খুঁজিয়া পায় না।

জীবনের যে মানে সে খোঁজে তাহা যে অসাধারণ বৈচিত্র্য, উত্তেজনা, ভূমিকম্প, রোগশোক ও আতঙ্কের সমারোহ ভিন্ন আর কিছু নয়। মদের তৃষ্ণা জলে মিটিবে কেন? নিত্য পাত্র ভরিয়া তীব্র সুরা সম্মুখে ধরিবে মানুষের জীবন তেমন সাকীও নয়।

রাত্রে প্রসন্ন আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখে।

একটা খাড়া উঁচু পাহাড়। তার উপরে প্রসন্নের স্কুল। অনেক বয়সে স্কুলে পড়িতেছে বলিয়া প্রসন্নের বড় লজ্জা, টিফিনের ছুটির সময় স্কুলের সামনে পাহাড়ের একেবারে ধারে সে চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ একটা ছেলে তাহাকে এমন ধাক্কাই দিল যে পাহাড়ের নীচে আছড়াইয়া না পড়িয়া প্রসন্নের আর উপায়

নাই ; কারণ আজ শাড়ী পরিয়া স্কুলে আসিয়াছে বলিয়া উড়িবার প্রক্রিয়াটা সে ভুলিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের ঠিক নীচে একটা ইঁদারা, শূন্যে পড়িতে পড়িতে প্রসন্ন বিবেচনা করিয়া দেখিল ইচ্ছা করিলে ইঁদারার মধ্যেও পড়া যায় অথবা একটু বাঁকিয়া ইঁদারার পাকা বাঁধানো পাড়ের উপরেও আছড়ানো চলে। কি করা উচিত ?

আধাআধি পড়িয়া সে মন স্থির করিয়া ফেলিল। ইঁদারার জলে পড়িলে লাগিবে না বটে, কিন্তু ওর মধ্যে আবছা অন্ধকার, ওর মধ্যে অজানা রহস্য। তাছাড়া নিজের চেষ্টায় উঠিয়া আসিতে না পারিলে ওর মধ্যেই তাহাকে বাকী জীবনটা কাটাইতে হইবে। হেড মাষ্টার নিয়ম করিয়াছেন কোন ছেলে ইঁদারায় পড়িলে তাহাকে আর তোলা হইবে না।

নৌকার হালের মত হাতের খাতায় বাতাস কাটিয়া প্রসন্ন ইঁদারার পাড়ে আছড়াইয়া পড়িল।

হাত পা ভাঙিল না বটে, কিন্তু আঘাত লাগিল, সত্যিকারের আছাড় খাওয়ার সমানই। স্বপ্নে আর বাস্তবে ও ছাড়া আর তফাৎ আছে কি ? ভালবাসিয়া যাহাকে পাই নাই, স্বপ্নে সে পাশে আসিয়া বসিলে এই স্বপ্নে পাওয়ার মধ্যে শুধু বাস্তবতার ফাঁকিটুকুই থাকে বলিয়া বাঁচা সম্ভব হইয়াছে। স্বপ্নকে তাহার ন্যায্য মূল্য দিতেই হইবে।

প্রসন্ন উঠিয়া আলো জ্বালিল। জল খাইয়া গায়ে একটা চাদর জড়াইয়া চুপচাপ বিছানায় বসিয়া রহিল। শুধু বাড়ী নয়, সমস্ত পাড়াটা নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে। আলোটা ভয়ে ভয়ে মিটিমিটি

জলিতেছে, রাস্তার আলো এতখানি অন্তরালে যে অস্তিত্বের মৃদু প্রমাণটাই বিস্ময়কর।

এ যেন রাত্রি নয়, শঙ্কার কুয়াশা।

প্রসন্ন ভাবিতে লাগিল, একটা বউ থাকিলে এসময়ে কাজ দিত। প্রেমালাপ নয়, মানুষের সঙ্গে দুটি সাধারণ কথা বলিবার এত বড় প্রয়োজন কি সচরাচর আসে? বউ নিশ্চয় তাহার ভয়ের ভাগ লইত, দু-চোখ বড় বড় করিয়া ভীত কণ্ঠে বলিত 'কি গো? কি?' সে বলিত 'কিছু না, বড্ড মশা লাগ্ছে। উঠে মশারিটা একবার ঝাড় না?'—'আলোটা বাড়িয়ে দাও, আমার বড় ভয় করছে।' 'আমি রয়েছি ভয় কি?' বলিয়া সে হাসিত। বউ তথাপি বলিত, 'না না, আলোটা তুমি বাড়িয়ে দাও।'

মা কেমন করিয়া টের পাইয়াছিলেন, উঠিয়া আসিয়া জানালা দিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'রাতদুপুরে আলো জ্বেলে বসে রয়েছিস যে?'

'একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম, মা।'

'তা দেখবি না? যে অন্যাচারটাই তুই করিস্। কাপড়ে ভাত পড়ল, পই পই করে বারণ করলাম কানে তুললি না, সেই কাপড়ে এসে শুলি। নে, মা দুর্গাকে ডেকে আলো নিবিয়ে ঘুমো।'

পরদিন সকালে মা বলিলেন, 'এবার একটা বিয়ে কর বাবা, মাথা খাস। রোজগার-পাতি করছিস্—'

সকালে বউয়ের প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে, খবরের কাগজটা নামাইয়া প্রসন্ন বলিল, 'কানপুরে কি ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে জান মা? একটা আপিসের ছাদ ভেঙে সাতজন কেরাণী মারা গেছে, পনের জন জখম হয়েছে।'

মোটা হেডিংটা দেখাইয়া মা বলিলেন, 'ওই লিখেছে বুঝি?'

'না, ওটা যুদ্ধের খবর।'

'পড়্ ত, শুনি।'

'যুদ্ধের খবর আর কি শুনবে মা? কানপুরের কাণ্ডটা কি ভয়ানক বল ত! আপন মনে সবাই কাজ করছে, কেউ কিছু জানে না, হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে ছাদ ভেঙে সাতজনের কবর হয়ে গেল, পনের জন জখম হ'ল। ভাবলে গা শিউরে ওঠে।'

বলিয়া প্রসন্ন উপরের দিকে তাকাইল। এ বাড়ীর কড়িবরগা সমস্তই লোহার। ছাদ ভাঙিবার সম্ভাবনা তেমন নাই। সে মৃদু মৃদু হাসিল। ভাবিল, খবরের কাগজের খবরগুলিও ওষুদের বিজ্ঞাপনের মত এমন হিপ্‌নটিক! ষ্টোভ-দুর্ঘটনার বিবরণ পড়া অবধি আজকাল সে কত ভয়ে ভয়ে ষ্টোভ জ্বালায়, মাকে জ্বালাইতে দেয় না চাকরকেও না।

চাকরি পিতৃবন্ধুর কল্যাণে। পিতৃবন্ধু আপিসের বড়বাবু। ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় প্রসন্নকে তিনি ভালবাসেন। দোষ করিলে ধমকান না, মাঝে মাঝে ডাকিয়া উপদেশাদি দেন এবং কামানো চিবুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কি যেন ভাবেন।

ঠিক যেন ভাবেন না, দুশ্চিন্তা করেন।

সুতরাং অল্পকালের মধ্যে প্রসন্নর প্রমোশন হইল। সবদিক দিয়াই সে উপরে উঠিল, তাহার মাহিনা যেমন বাড়িল সত্তর হইতে আশী টাকায়, তাহাকে কাজ করিতে হইল একতালা হইতে একেবারে চারতলায় উঠিয়া গিয়া। বড়বাবুর পক্ষপাত-ভরা দরদ প্রসন্নকে এমন বিচলিত করিল বলিবার নয়।

বড়বাবু ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমার বয়স কত হ'ল হে প্রসন্ন ?'

'আজ্ঞে, সাতাশ।'

'বল কি, সাতাশ! বিয়েটিয়ে ক'রে এবার সংসারী হও? না, ও-সব ইচ্ছা নেই ?'

প্রসন্ন চোখ নামাইয়া বলিল, 'আজ্ঞে সামান্য আয়—'

বড়বাবু কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি যখন বিবাহ করেন তাঁহার এক পয়সা আয় ছিল না। স্ত্রী কি তাঁহার খাইতে পায় নাই? প্রসন্ন আশী টাকা বেতন পায়, দেশে বাড়ীঘর জমি-জায়গা আছে, বিবাহ করিতে হইলে কি রাজা হইতে হয় না কি? তারপর—

'আমি যদ্দিন এখানে বড়বাবু আছি, মাইনে বাড়ার ভাবনাটা তোমার ভাবতে হবে না বাপু।' বলিয়া বড়বাবু হাসিলেন।

এ ত শুধু চুম্বক, কথা তিনি কম বলেন নাই। দুর্ভাবনায় ঘামে হাতের তেলো ভিজাইয়া প্রসন্ন নীরবে আগাগোড়া সবটাই শুনিল। বড়বাবুর কন্যাটিকে সে দেখিয়াছে। লোভ করা যায় এমন সে মেয়ে, তাছাড়া বাপ তার বড়বাবু। হইলে সব দিক দিয়া ভালই হয়। প্রসন্ন কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ পাইতেছিল না। অমন একরাশি কালো চুল পিঠে ছড়াইয়া অল্প বিরক্তিতে ভ্রূদুটি অমন ভাবে একটুখানি কুঁচকাইয়া যে মেয়ে ও রকম আশ্চর্য্যকণ্ঠে বলিতে বলিতে পারে 'বাবা বাড়ী নেই' তাহাকে বিবাহ করা কি ভয়ের কথা? ও মেয়ের সঙ্গে একা একঘরে বসিয়া আছে কল্পনা করিলেও তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে থাকে। ওকে বিপদ বলিয়া ভাবা যায়, বউ বলিয়া কোন মতেই যেন ভাবা যায় না।

এদিকে বড়বাবুকে না বলিবার সাহসই বা সে কোথায পায ?

বড়বাবুর বুদ্ধি-বিবেচনার উপর প্রসন্নর শ্রদ্ধা কমিয়া গেল। নিজের ঘরে ফিবিয়া গিযা সে ভাবিতে লাগিল, নিজের মেযের উপরেও কি লোকটার কিছুমাত্র মমতা নাই ? অমন মেযেকে কি বলিযা তাহার মত লোকের হাতে সঁপিযা দিতে চায ? দেশে কি সুপাত্রেব অভাব ঘটিয়াছে ?

যেখানে বসিয়া প্রসন্ন কাজ করে তার পাশেই প্রকাণ্ড একটা জানালা। পাঁচ সাতজন মানুষ একসঙ্গে গলিযা যাইতে পাবে জানালাটা এত বড়। শিক নাই। তা তিনতলার জানালায শিকের কি প্রয়োজন ? গলিযা পড়া সহজ বলিয়াই কে আব তিনতলার জানালা দিয়া গলিয়া নীচে পড়িতেছে ? মানুষ ত পাগল নয় !

কাজ করিতে করিতে প্রসন্ন বার-বাব জানালায উঠিযা যায়। শহরটা ইটের বটে। পথ দিয়া গাড়ী ঘোড়াব আর মানুষের স্রোত বহিযা যায়, পথটা যেন নদী। নীচু ফুটপাথটার দিকে চাহিযা প্রসন্নব গা একটু ছম্ ছম্ করে।

লিফটে উঠিবার সময় যেমন হয তেমনি একটা অনুভূতি, কেবল তীব্রতা কম। গভীর কিন্তু তীব্র নয়।

আজ বিচলিত মন লইয়া খোলা জানালার দাঁড়াইয়া প্রসন্ন প্রথম অনুভব করিল যে, ফুটপাথটা আসলে বেশী নীচু নয়, তিন-তলার মানুষের অনায়াস মরণ বিছানো আছে বলিয়াই অত নীচু মনে হয়। ফুটপাথের চৌকা পাথরের প্রান্তগুলি সে বেশ দেখিতে পাইতেছে। একটা কলার খোসা পড়িয়া আছে ইহাও তাহার লক্ষ্য

এড়ায় নাই। প্রসন্ন একদৃষ্টিতে কলার খোসাটার দিকে চাহিয়া রহিল। তিনতলা হইতে লাফাইয়া পড়িলে মানুষ বাঁচে কি না এই কৌতুককর সমস্যাটা তাহাকে হঠাৎ আজ বিব্রত করিয়াছে।

মরবেই যে এমন কোন মানে নাই। বাড়ীতে আগুন লাগিলে ইহার চেয়ে উঁচু হইতে লাফাইয়া মানুষ প্রাণ বাঁচাইয়াছে, আর এই জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িলে বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকিবে না? বাড়ীতে আগুন লাগিয়া হোক্‌, ছাদটা ধ্বসিয়া পড়ার উপক্রমেই হোক্‌, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাকেই যদি এই জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে হয়, তাহাকে মরিতেই হইবে?

প্রথমটা ক্ষুব্ধ হইয়া শেষে প্রসন্ন শান্ত হইল। মরেও যদি, মন্দ হয় না। তাহাকে ঘিরিয়া রাস্তায় ভীড় জমে, আপিসসুদ্ধ সকলে ছুটিয়া নীচে নামে, চকিতের জন্য বড়বাবুর মনে কন্যার বৈধব্য সংঘটিত হয়, য়্যাম্বুলেন্স আসে, সমারোহের আর সীমা থাকে না। বৃদ্ধ বয়সে রোগশয্যায় শুইয়া মরার চেয়ে এ মৃত্যুতে বেশ খানিকটা অভিনবত্ব থাকে।

সেদিন কাজে আর তাহার মন বসিল না। বার-বার উঠিয়া গিয়া সে দেখিয়া আসিতে লাগিল, কলার খোসাটা তখনও পড়িয়া আছে কি না। তাহার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, তাহার চোখের সামনে একজন খোসাটায় পা দিয়া পিছলাইয়া পড়ে, দেখিয়া মনের আনন্দে সে খানিক হাস্য করে। এত লোক চলিতেছে পথে, কারও পা কি খোসাটায় পড়ে না? এমনি সব সাবধানী পথিক যে পা পিছলাইয়া পড়াটাও সকলে সাবধানে বাঁচাইয়া চলে?

কলার খোসাটার সদ্গতিই হইল। প্রসন্নর চোখের সামনে একটা গরু সেটা খাইযা গেল! ক্ষুণ্ণমনে সে টেবিলে ফিরিয়া গেল। সেদিন আর জানালায় উঠিযা যাইবার ইচ্ছা তাহার হইল না। কলার খোসার অপচয়কে উপলক্ষ করিযা জানালা দিয়া লাফাইযা পড়িতে না পারার দুঃখ তাহার মনে মৃদু বিষের মত প্রভাব বিস্তার করিল, আকাশের রহস্যভরা সুনীল রূপ দিগন্তবিস্তৃত ইটের স্তূপের গম্ভীর মহিমা, আর জানালার ঠিক নীচে পাথর-বাঁধানো ফুটপাথ প্রসন্নের কাছে সমস্ত আকর্ষণ হারাইযা ফেলিল। কাহার উপর অভিমান কবা উচিত সে ঠিক বুঝিযা উঠিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল কে যেন তাহাকে ঠকাইতেছে, ক্রমাগতই ঠকাইতেছে।

প্রসন্ন চমকাইয়া উঠিল। বড়বাবু কাঁধে হাত রাখিযাছেন।

'মাকে ব'লো হে, রবিবার দেখা করতে যাব।'

'আজ্ঞে, বল্‌ব।'

তিনতলায কাজ আরম্ভ করা অবধি প্রসন্ন নানা ছলে লিফ্‌টে ওঠানামা করিয়াছে। একটা ছোটখাট ঘর, মেঝে আছে, দেয়াল আছে, ছাদ আছে, তার মধ্যে মিনিটখানেক বন্দী থাকিয়া সোঁ করিয়া উপরে ওঠা নীচে নামা কি রোমাঞ্চকর রোমান্স! আজ সে সিঁড়ি দিয়াই নীচে নামিল। লিফ্‌টের মোহ আজ তাহার নাই। যার এমন বিপদ ঘটিতে বসিয়াছে অত সখে তাহার কাজ কি? জীবনে সহসা যে সমস্যা দেখা দিয়াছে এখন গভীর ভাবে সে বিষয়ে চিন্তা করিযা দেখা দরকার। মেযেটাকে আর একবার দেখিতে পারিলে ভাল হইত। একবার মাত্র দেখিয়া ওকে

যেন বেশী রহস্যময়ী মনে হইতেছে। অল্প বিরক্তিতে ঠিক কি ভাবে সে ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত করে আর একবার না দেখিয়া ও-মেয়েকে বিবাহ করা বোধ হয় সুবিবেচনার কাজ হইবে না।

অন্যমনে বাসে উঠিতে গিয়া প্রসন্ন পড়িতে পড়িতে অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেল। ভিতরে বসিয়া লজ্জায় সে কাহারও দিকে চাহিতে পারিল না। অপরাধ সে কারও কাছে করে নাই, কিন্তু সেজন্য শাস্তি আটকায় না, এমনি মন্দ তাহার কপাল। রাত্রে ঘুমাইতে সে যে কষ্টটা পাইল তাহার তুলনা হয় না। বড়বাবুর মেয়েটি যেন কড়া নেশা, তাহার কল্পনা সেই নেশারই অবসাদ; নিস্তেজ অথচ নির্ম্মম; তাহার বেশ ঘুম আসিতে থাকে, শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া চিন্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে জট পাকাইয়া যায়, ঘুমাইয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই,—সহসা সে পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হইয়া ওঠে। জাগরণ এমন আকস্মিক হয় যেন চমক্ লাগে। সার্কাসের তাঁবুতে পাঁচ ছয়টা উঁচু দোলনার একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিবার কসরৎ করিতে করিতে এ কি ঘুম ভাঙা!

এমনিভাবে তাহার রাত্রি প্রভাত হইল। সকালে সে মাকে বলিল, 'তাড়াহুড়ো ক'রে রাঁধবার দরকার নেই মা। আজ আপিস যাব না।'

মা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রসন্ন বলিল, 'রাত্রে তাহার জ্বর আসিয়াছিল।' মা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, 'ওষুধপত্তর কিছু খা বাবা তুই। বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে তোর চেহারা।'

প্রসন্ন মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ওষুদপত্রের ব্যবস্থাই হচ্ছে মা।'

বিবাহের প্রক্রিয়াটা প্রসন্ন সাহসী পুরুষের মতই সহ্য করিল।

বিশেষ কঠিন নয়, কারণ নিজের তাহার কিছুই করিবার নাই, যাহা দরকার অন্যে করাইয়া লয়। তাহার ভয় ছিল বাসরে। একগাদা মেয়ে যখন,তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিবে হালভাঙা নৌকার মত টলমল করিলে চলিবে না, নিজেকেই তাহার চারিদিক সামলাইয়া চলিতে হইবে। ঘর নির্জ্জন হইলে বউয়ের সঙ্গে ভাবও করিতে হইবে তাহাকেই।

বাসর বসিতে রাত বারোটা বাজিয়া গেল। মেয়েরা হাসিল, ফাজলামি করিল, গান গাহিল, রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত। তবু কি তাহারা উঠিতে চায়—এই যে আরম্ভ এ যাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, কারণে অকারণে স্বামী এখন যার বকে, অসুস্থ শিশু যার দিবারাত্র ককায়, পরের জীবনে এই আরম্ভকে সেও ঘাঁটিতে চায়, ইহাকে প্রকাশ্য ও সাধারণ করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কম নয়। বাসরে বিবাহিতা মেয়েরাই ভীড় করে বেশী। বিবাহোৎসবে সধবা নারী অপরিহার্য্য এবং সে নিয়ম তাহাদেরই তৈরি।

প্রসন্ন ইহাদের চিনিতে পারিল না। সংসারের সংস্রবে সে এত বড় হইয়াছে, ইহাদের জীবনী তাহার অজানা নয়, এত উল্লাস ইহাদের আসে কোথা হইতে? অবাধে ইহারা আনন্দ করিতেছে, হাসি ইহাদের আন্তরিক, দেখিয়া মনে হয় না জীবনে ইহাদের কোনদিন দুঃখের ছায়াপাতও হইয়াছিল। একে একে প্রসন্ন উপস্থিত প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, কারও চোখ দুটিতে পর্য্যন্ত বিষণ্ণতার আভাসটুকু নাই, খুব যে নিরীহ সেও হাসিমুখে অন্যের পরিহাস উপভোগ করিতেছে, দু-চোখ খুশীতে চপল। প্রসন্ন সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, সংসারে শোক-তাপ নাই

একথা সত্য নয়, তার বড় ভাগটা মেয়েরাই গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ব্যক্তিগত জীবনকে কিছুকালের জন্ম অতিক্রম করিয়া যাওয়ার প্রক্রিয়াটা ইহাদের বোধ হয় জানা আছে।

ভাবিয়া প্রসন্ন খুশী হইল। খানিক পরে যে-স্ত্রীর সঙ্গে তাহার আলাপ করিতে হইবে সে ইহাদের স্বজাতীয়া। সে প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার দরুণ ইহারা কান্নার সময় প্রাণ দিয়া কাঁদিয়া হাসিবার সময় নির্ব্বিকার চিত্তে হাসিতে পারে, বড়বাবুর মেয়ের মধ্যেও সে দুর্ব্বলতা নিশ্চয় আছে। সকল নারীর মত তার বউও জীবনকে যাচাই করিবে না, হাসিকান্না যাহাই আসুক বিনা প্রতিবাদে দ্বিধামাত্র না করিয়া গ্রহণ করিবে, এমনি একটা সান্ত্বনা প্রসন্নকে খানিক আশ্বস্ত করিল। আড়চোখে সে একবার চেলি-পরা বউকে দেখিয়া লইল। বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিলেও সে বিশ্বাস করিল দুঃখ এবং আনন্দের মত স্বামীকেও সমগ্র সত্তা দিয়া গ্রহণ করিবার শিক্ষা এ মেয়ের হইয়াছে, স্বামীকে ভালবাসা হাসা-কাঁদার মতই ইহার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক।

ইহার অস্থিমজ্জায় নিঃসন্দেহ স্বামিপ্রেম আছে এবং সে প্রেমে শ্রদ্ধা-ভক্তির অংশটা অন্য মেয়ের চেয়ে কম নয়।

ক্রমে মেয়েরা বিদায় লইল। বাহির হইতে কে যেন দরজায় শিকল তুলিয়া দিল।

প্রসন্ন মুহূর্ত্তে পাংশু হইয়া গেল।

যে মেয়েটি শিকল দিয়াছিল বাহির হইতে সে পরিহাস করিয়া বলিল, 'কই গো বর, খিল চড়াবার শব্দটা পাচ্ছি না যে? আমাদের ভদ্রতার এতখানি বিশ্বাস ক'রো না, ঠকে যাবে।'

প্রসন্ন এতক্ষণে উঠিয়া গিয়া বারান্দার দিকের বন্ধ জানালাটা খুলিয়া ফেলিয়াছে। তাহার হৃদ্‌পিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইতেছিল। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিল, 'শিকল দিলেন কেন? খুলে দিন।'

বউ ঘোমটা ফাঁক করিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। এ কি রকম বর?

বারান্দার মেয়েটি চলিয়া যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিয়া গেল, 'কাল সকালে খুলব।'

কাল সকাল! সমস্ত রাত তাহাকে এই ঘরে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে, ইচ্ছা করিলেও বাহিরে যাইতে পারিবে না? কি ভয়ানক। প্রসন্ন মিনতি করিয়া বলিল, 'না না, এখুনি খুলে দিন। আমি একবার বাইরে যাব। দেখুন ত কি করছেন আপনি!'

ছোট একটি কীল দেখাইয়া মেয়েটি হাসিমুখে চলিয়া গেল।

প্রসন্ন খাটে গিয়া বসিল। তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম বাহির হইয়াছে। ঘরের বাতাস তাহার নিশ্বাস লওয়ার পক্ষে অপ্রচুর।

কত জল্পনাকল্পনাই সে করিয়া রাখিয়াছিল! সে-সব কিছুই হইল না। বিপন্ন হইয়া প্রসন্ন এই বলিয়া স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপ আরম্ভ করিল—

'তোমার ভাইটাই কাউকে ডেকে বল না শিকলটা খুলে দিক!'

বউ মৃদুস্বরে বলিল, 'একটু পরেই খুলে দেবে!'

প্রসন্ন তাহা জানে। এ যে কৌতুক, দশপনের মিনিট পরে মেয়েটি যে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া শিকল খুলিয়া দিয়া যাইবে

ইহাতে তাহার একটুও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বস্তি মেলে না। বন্ধ ঘরে এক মুহূর্ত্ত থাকাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার দম আটকাইয়া আসে। যদি এখনি একটা অঘটন ঘটিয়া বসে সে কি করিয়া ঘরের বাহির হইবে? অপমান হইতে রক্ষা পাইবে কি করিয়া? 'না, এখুনি খুলে দিতে বল। এসব কি? এসব আমি ভালবাসি না।'

নিরুপায় বউ চুপ করিয়া রহিল।

অন্ধ

একটি মেয়ে ছিল সনাতন চক্রবর্ত্তীর—মোহিনী। একটা বাড়ীও ছিল সনাতনের বেশ—বড় দোতালা বাড়ী আর ছিল কিছু নগদ টাকা,—কয়েক হাজার। মেয়ের বিবাহ দিবার অনেক আগেই মনে মনে একটা মতলব করিয়া রাখিয়াছিল সনাতন: ঠিক মতলব নয়, হিসাব—উত্তরাধিকারিণী হিসাবে তার মৃত্যুর পর মেয়েটাই যখন তার বাড়ীটা পাইবে, বিবাহের সময় পণ হিসাবে জামাইকে সে দিবে না একটি পয়সাও। মেয়েকে গয়নাগাঁটিও দিবে কম, যত কম দিয়া পারা যায়। বুড়া বয়সে যখন তার চাকরী থাকিবে না, জমানো টাকা কয়েকটা তখন মদের খরচ বাবদ লাগিবে না তাহার? কেউ কি তখন একটি পয়সাও তাকে দিবে মদের জন্য? বুড়া হইতে বা আর বাকীই কত!

মদ সনাতন কিছু কিছু খাইত সন্ধ্যার পর। মাতাল সে হইত না একদিনও। মনের ভুলে অন্যমনস্ক অবস্থায়, এমন কি মৃতা স্ত্রীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পর্য্যন্ত নয়। তবু মদ সে খাইত রোজ।

কি ভয়ানক মনের জোর যে ছিল সনাতন চক্রবর্ত্তীর! কি অপরিমিত ছিল যে তার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য! বছর কাটিত একটির পর একটি, জীবনকে কাটিয়া কাটিয়া বছরগুলি যথা-নিয়মে যেমন কাটে, ধারালো এবং ভোঁতা,—অনেক দিনের মৃতা স্ত্রীর জন্য হৃদয়টা রোজ নিয়মিতভাবে কেমন একটা বিশ্রী, শোচনীয় এবং অদ্ভুত কাণ্ড করিত বলিয়া মদ সে খাইত রোজ, মেয়ের মনে আঘাত লাগিবে বলিয়া একদিনও সে হইত না মাতাল, আইন মতে মেয়েটার যা প্রাপ্য শুধু তার লোভ দেখাইয়া চেষ্টা করিত জামাই সংগ্রহের

আর আত্মতৃপ্তির জন্ম প্রাণপণে প্রায়শ্চিত্ত করিত অতীত ও বর্ত্তমানের প্রত্যেকটি পাপের।

পাপ? কি পাপ করিত সনাতন? পাপের মধ্যে যে চরম পাপ সেই পাপ,—মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া সনাতনের অন্তর্যামী হিসাবে আমি, এই কাহিনীর লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এইখানে চুপি চুপি একটা কথা বলিয়া রাখি। সনাতনের অন্তরে একটা অপরিবর্ত্তনীয় সিদ্ধান্ত অনেকদিন বাসা বাঁধিয়া আছে—এ-জগতে সবাই পাপী। অন্য পাপ যে করে না, মানুষের মনে ব্যথা তো অন্ততঃ সে দেয়, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, জানিয়া হোক, না জানিয়া হোক, মানুষের মনে ব্যথা দেওয়ার চেয়ে বড় পাপ মানুষকে খুন করাও নয়। মানুষকে যে দুঃখ দেয় না সে দেবতার চেয়ে বড়; কারণ, দুঃখই মানুষের দেবতাকে জন্ম দিয়াছে: সুখটা মানুষের নিজস্ব কীর্ত্তি, দুঃখের দায়িত্ব দেবতার।

পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন এই কৌশলময় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার মধ্যে তলাইয়া দিলেও একটা প্রশ্ন থাকিয়া যায় প্রায়শ্চিত্ত? কি প্রায়শ্চিত্ত করিত সনাতন? পাপের যা একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত আছে,—অনুতাপ! প্রায় আধঘণ্টা কি তারও বেশী সময় ব্যাপিয়া নিয়মিতভাবে গম্ভীর আন্তরিক অনুতাপ, ফাঁকি নয়। তপস্যা করার মত নিবিষ্টচিত্তে অনুতাপ করিত সনাতন, রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম আসা পর্য্যন্ত আর সকালে ঘুম ভাঙিয়া বিছানা ছাড়িয়া ওঠা পর্য্যন্ত যেদিন রাত্রে সহজে ঘুম আসিত না সনাতনের, স্নায়বিক চাঞ্চল্য আনিয়া দিত সাময়িক অনিদ্রা রোগ, সেদিন তার অনুতাপের আর তুলনা থাকিত না, অনুতাপের তীব্রতায় তার মাথা দিয়া ছুটিতে থাকিত

আগুন। বুকে তার যে জ্বালা ছিল, এটা সম্ভবতঃ তারই হলকা। হায়, অনুতাপেই যখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত, মেয়ের মনে ব্যথা দিবার অতিরিক্ত পাপটুকু করিয়া কেন সনাতন বেশী মদ গিলিয়া অজ্ঞান হইয়া যাইতে পারিত না? রাগে, দুঃখে, অভিমানে তার প্রাণের জ্বালায় সনাতন হাঁকিত, মোহিনী! হ্যাঁ মা, শুনছিস?

কি বাবা?

আর একটু তাড়াতাড়ি বড় হতে পারিস না তুই? বিয়ে দিয়ে তোকে বিদেয় করি? তোর জন্যে আমি যে গেলাম!

মোহিনীর চোখে জল আসিত। আমাকে বিদেয় করার জন্যে...

সনাতন থতমত খাইয়া বলিত, কাঁদতে আরম্ভ করার আগেই তোর চোখ দিয়ে জল পড়ে, তোর মত মেয়ে আমি দেখিনি বাপু!

মেয়ের জামাই সংগ্রহ করা সনাতন যতটুকু কঠিন ভাবিয়াছিল আসলে দেখা গিয়াছিল ততখানি সহজ নয় ব্যাপারটা। ছেলেদের বাপেরা বোকা নয়, তারাও হিসাব জানে। কতদিনে সনাতন মরিবে, (লম্বা চওড়া পালোয়ানের মত চেহারা ছিল সনাতনের এবং জারো আগা নামে একটা মানুষ, না হোক সে বাঙালী আয়ুর দৈর্ঘ্যেই পৃথিবীকে চমক দিয়াছে) মরার আগে মতিচ্ছন্নতার দরুণ আবার বিবাহাদি করার ফলে তার যদি ছেলেমেয়ে হয় বাড়ীটা তবে ফস্কাইয়া যাইবে, তা ছাড়া যখন খুসী বাড়ীটা বিক্রী করিয়া দিলেই বা তাকে রুখিবে কে!

এসব যুক্তিতর্কের জবাবে সনাতন বলিত, আরে মশায়, সংসার করার ইচ্ছে থাকলে এ্যাদ্দিন চুপ করে বসে থাকতাম?

ষাট বছরের বেশী আমি কিছুতে বাঁচব না দেখবেন, কুষ্টিতে লিখেছে।

কেউ কেউ বলিত, বেশ ছেলের নামে দলিল লিখে দিন যে, বিয়ের পণ হিসাবে ··

সনাতন বলিত, না মশায়, আমাকে যে বিশ্বাস করে না তার ছেলের হাতে আমি মেয়ে দিই না। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

শেষে, সামান্ত কিছু পণ দিয়া মোহিনীর জন্ত যে জামাই পাওয়া গিয়াছিল তার নাম গিরিজাকুমার—আইন পড়িতেছিল। গিরিজা তবু সংসারের আইন-কানুনগুলি ভুলিয়া জীবনে কিছু নিষিদ্ধ কাব্যরস আমদানী করার চেষ্টা আরম্ভ করায় তার বাবা একটু তাড়াহুড়া করিয়াই দিয়া ফেলিয়া ছিলেন ছেলের বিবাহ, পরে করিয়া ছিলেন আপশোষ। দেনা-পাওনা এবং বৌ কোনটাই তার পছন্দ হয় নাই, বাড়ীর অন্তান্ত সকলেরও নয়। শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ সবই ছিল মোহিনীর, তাই বিবাহের পর সে বড় যন্ত্রণা পাইয়াছিল কয়েক বছর—অনেক ধমক, অনেক ছ্যাচা, অনেক দায়িত্ব।

শুনিয়া সনাতন বলিল, তাহোক, পরে সুখ পাবে। প্রথমে যে বৌ দুঃখ পায় পরে তার সুখ নির্ঘাৎ। আমার বৌ সাত বছর রাজরাণীর মত সুখ পেয়েছিল বলেই না—

(স্ত্রীকে সাত বছর রাজরাণীর মত সুখও যোগাইয়াছিল সনাতন, তারপর ভিখারিণীর মত দুঃখও দিয়াছিল সে। এই বাড়ী করার ঝোঁকে এমনিই হয়। প্রথমে রাজরাণীর মত সুখ পাইয়াছিল বলিয়াই না তার রাজরাণীত্ব খসাইয়া একটা ইটের

বাড়ী করার ঝোঁক ভগবান সনাতনের মধ্যে জাগাইয়া দিয়াছিলেন। স্ত্রীর বদলে বাড়ী। সাত বছর যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মনে হইত বুকের পাঁজর ফাঁক করিয়া একেবারে হৃদয়ে চালান করিয়া দিতে না পারিলে সাধ মিটিবে না, সেই স্ত্রীর বদলে একটা চুণ-সুরকি ঢাকা সাজানো ইটের স্তূপ! সুখের পর দুঃখ আর দুঃখের পর সুখ শুধু এই নিয়মটা বজায় রাখার জন্য ছাড়া কেন ভগবান তার মনে উদ্ভট বাড়ী-প্রেম আনিয়া দিবেন, রামচন্দ্রের প্রজানুরাগের মত?

শ্বশুর স্বর্গে যাওয়ার পর স্বামী-গৃহে মোহিনীর কিছু প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে করিতে সনাতনের বয়স হইয়া গিয়াছিল চুয়ান্ন। ওকালতীতে গিরিজার ভাল পসার হয় নাই, বাপ মারা যাওয়ায় চাকরী করিয়া তিনি যা আনিতেন তাও বন্ধ হইয়াছিল। গিরিজা নিজে এবং তার তাগিদে মোহিনী সনাতনকে ক্রমাগত তোষামোদ করিতেছিল যে এবার তারা এ বাড়ীতে আসিয়া থাকুক না? এত বড় বাড়ীতে একা আছে সে; আহা না জানি কত তার অসুবিধা হয়! সেবার দরকার তো এই বয়সেই মানুষের বেশী। সনাতন রাজী হইত না, বলিত, না বাপু, না—যেদিন মরব সেদিন আসিস। আমি জন্মের মত বেরিয়ে যাব, তোরা জন্মের মত ভেতরে ঢুকবি —সে পর্য্যন্ত শান্তিতে একটু থাকতে দে আমায়।

একাকীত্বের বোঝা বহিয়া শান্তিতে থাকার অর্থ সনাতন হয় ত বুঝিত নির্ব্বিবাদে মাতাল হইতে পারা তাও ডাক্তারের বারণ না মানিয়া। চোখের ডাক্তার; দৃষ্টি সনাতনের ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। ডাক্তার স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছিলেন, মদ না ছাড়িলে চোখ দুটী তাকে

ছাড়িতে হইবে। তবু, অভদ্র রকমের মাতাল হওয়ার মত মদ না খাইলে অন্ধ হইতে হয়তো কিছু সময় লাগিত সনাতনের। অন্ধ হওয়ার আগেই মরণের অন্ধকারটার নাগাল পাওয়াও তার পক্ষে কিছু মাত্র আশ্চর্য্য ছিল না। কিন্তু এ সব কিছুই সে মানিত না, নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে মাতাল হইত, মাতাল হইতে হইতে হইয়া যাইত একেবারে অচৈতন্য।

একটা আশ্চর্য্য যুক্তি ছিল সনাতনের, আত্মসমর্থনের একটা অখণ্ডনীয় দার্শনিকতা, কার জন্য মাতাল হইবে না, কেন হইবে না? এই যুক্তিতে সে যদি মাতাল হইতে পারে; কার জন্য অন্ধ হইবে না, কেন হইবে না? এই যুক্তিতে সে অন্ধ হইতে পারিবে না কেন?

নিজের জন্য? এ জগতে মানুষের যে সব চেয়ে বেশী আপন, সেই নিজেটার জন্য? অন্ধ হওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও মদ যে সে গিলিত সে তো নিজের জন্যই? নিজের জন্য ছাড়া সব রকমে নিজেকে কেউ ধ্বংস করে?

ছাপান্ন বছর বয়সে, জমানো টাকাগুলি প্রায় শেষ করিয়া সে যখন সবে ধার করিয়া বোতল-রসায়ন পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সনাতন হইয়া গিয়াছিল অন্ধ! ছাপ্পান্ন বছর আগে চোখ ফেলিয়াই সনাতন দেখিতে পাইয়াছিল আলো,—ছোট একটা ঘরের আধ ভেজানো জানালার ফাঁক দিয়া ঢোকা দুপুর বেলার রাগী সূর্য্যের মৃদু প্রীতিময়, প্রতিফলিত আলো, ছায়ার রসে ভেজা—এতদিনে যবনিকা সেই দেখার!

পুরাণো ইতিহাস এ সব, ভূমিকা। আগাগোড়া ক্রিয়াপদগুলি

অবশ্য ব্যবহার করিয়াছি অতীতকালের, তবু বলিয়া দিলাম। বলিয়া না দিলে অনেকেই ইতিহাস ও কাহিনীর পার্থক্য বোঝে না। অথচ মুস্কিল এই যে, সব কাহিনীই ঐতিহাসিক, অতীতকালের নিছক ধারাবাহিকতা।

ছাপ্পান্ন বছর বয়সে সনাতন করিল কি, জামাইকে পাঠাইয়া দিল একখানা চিঠি। চিঠিখানা সে লেখাইল তার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে দিয়া। আত্মীয় বেচারী সনাতনের চিঠি লিখিবার জন্ম অবশ্য আসে নাই, সনাতনকে সমবেদনা জানানোর জন্তও নয়। গোটা পাঁচেক টাকা যদি আদায় হয় এই ক্ষীণ আশা বুকে করিয়া তাগিদ দিতে আসিয়াছিল একশো টাকার ঋণ পরিশোধের।

চিঠি পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে ভাড়াটে বাড়ী ত্যাগ করিয়া গিরিজাকুমার সপরিবারে আসিয়া এ বাড়ীতে আস্তানা গাড়িল। মোহিনীর বিবাহের সময় যত বড় ছিল তার চেয়ে অনেক ছোট হইয়া গিয়াছে গিরিজার পরিবারটি। স্বর্গে গিয়াছে গিরিজার বাবা, কাকা, পিসি এবং কাকার একমাত্র ছেলেটি, শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে, একরকম জন্মের মতই, গিরিজার নিজের তিনটি বোন, গিরিজার মেজভাইটি চাকরী করিতে গিয়াছে পাটনায়, আধ-পাগলা ভাইটি হইয়া গিয়াছে নিরুদ্দেশ এবং দূরসম্পর্কের একটি যে বিধবা আত্মীয়া আশ্রিতা হিসাবে ছিল তাকে দেওয়া হইয়াছে তাড়াইয়া (দূর দূর করিয়া নয়, কৌশলে)। অত দূরসম্পর্কিতাদের আশ্রয় দিলে গিরিজার চলিবে কেন ? কাকার ছোট মেয়েটাকে যে থাকিতে দিয়াছে তাই ঢের।

এতকাল পরে বড়বৌটার (হতচ্ছাড়ী) বাপটার (ঠক, জুয়াচোর) সুমতি হওয়ায় গিরিজার মা শীতলা বড় খুসী হইয়াছিল। বাতে পঙ্গু শীতলা। এখন একরকম শয্যাশায়ী। গাড়ী হইতে নামাইয়া সকলে চ্যাংদোলা করিয়া তাকে নীচের তলায় কোণার দিকের একটা ঘরে শোযাইয়া দেওয়ার পর খানিকক্ষণ সে শুধু হাঁপাইল, তারপর আরও খানিকক্ষণ ধবিয়া করিল পথের কাটা দুর। .গিরিজা মোহিনী প্রভৃতি সকলে উপরে নীচে ঘরদুয়ার প্রভৃতি ঠিকঠাক করিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—তাড়াতাড়ি জাঁকিয়া আস্তানা গাড়িয়া বসা ভাল, কে জানে কখন আবার পাগলা সনাতনের মতিচ্ছন্ন হয়। শীতলার কাছে কেউ ছিল না, কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর ভারি মোটঘাট নাড়াচাড়া করার পরিশ্রমে ঘামে-ভেজা লাল মুখ যে মেয়েটা ঘরে আসিল তার নাম আনু। গিরিজার কাকার সে ছোট মেয়ে।

শীতলা বলিল, ডেকে মবছি কখন থেকে, কানে যায় না বুঝি হারামজাদি? ডাকতো একবার তোর বৌদির বাপটাকে—কি রকম মানুষ বাবা! এতকাল পরে মেযে-জামাই এল, বেয়ান এল বাড়ীতে, না একবার নামলো নীচে, না জিজ্ঞেস করল একটা কথা! এমনি বাপ না হলে অমন মেযে হয। বড় বৌটার মত, অমন লক্ষ্মীছাড়া পেটবোগা—

সে অনেক কথা, শোনাও কঠিন, লেখাও অভদ্রতা। আনু ভয়ে ভযে বলিল, বৌদির বাবা যে অন্ধ জেঠিমা, নীচে নামবেন কি করে?

সে ভাবনা তোর কেন লো ছুঁড়ি? ডাকতে বললাম, ডেকে আনগে তুই, কানের কাছে বক বক করে জ্বালাস নি আমায়। এমনি বলে মরছি আমি নিজের—

দরজার বাহিরে চমক দেওয়া গম্ভীর গলা-খাঁকারির আওয়াজে শীতলা থামিয়া গেল, আন্নু উঠিল চমকাইয়া।

এদিক ওদিক লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে ঘরে ঢুকিল সনাতন। মেয়েকে তার অনেক যন্ত্রণা দিয়াছে শীতলা, তবু বাড়ীতে যখন আসিয়াছে মানুষটা একটু অভ্যর্থনা জানানো কি উচিত নয়? ছোট অন্ধকার ঘর, জানালাগুলি প্রায় সবই বন্ধ। তবে আলো-অন্ধকার সনাতনের কাছে সমান হইয়া গিয়াছে। আগাইতে আগাইতে সে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন বেয়ান?

এ বড় প্রিয় প্রশ্ন শীতলার। সবিস্তারে এ প্রশ্নের জবাব দিতে সে বড় ভালবাসে, কিন্তু কৌতূহলও শীতলার বড় কম জোরালো নয়।

নিজে নিজে নীচে নামলেন নাকি বেয়াই, এঁ্যা? কি অবাক কাণ্ড মা! একটু একটু বুঝি দেখতে পান চোখে তাহলে, ঝাপ্সা-ঝাপ্সা মত?

সনাতন মাথা নাড়িল, একটুও দেখতে পাই না বেয়ান। একদম অন্ধ হয়ে গেছি।

মেঝেতেই বিছানা হইয়াছিল শীতলার, ওবেলা না হয় কাল চৌকী আসিবে। সনাতন দাঁড়াইয়াছিল একেবারে বিছানার পাশেই, কথা বলিয়া একপা আগাইতেই (একেবারে যে অন্ধ হইয়া গিয়াছে তার পা বাড়ানো একটু সৃষ্টিছাড়া রকমের বলিয়াই

বোধ হয়) পা'টা গিয়া পড়িল শীতলার বাত-ব্যথিত হাঁটুর উপরে। সনাতন ভর দিয়া দাঁড়াইলে হাঁটুটা হয় ত শীতলার ভাঙিয়াই যাইত,—তু'মণ তেত্রিশ সের ওজন সনাতনের।

শীতলার আর্তনাদে সে পিছাইয়া গেল।

লাগল বেয়ান? এ্যাঁ লাগল?

শীতলার সরু গলার চেঁচানি কলের বাঁশীর মত দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গিরিজা আসিল, মোহিনী আসিল, বাড়ীর মাঝ বয়সী দাসীটি আসিল। সেবা, সমবেদনা, কৈফিয়ৎ, তোষামোদ এসব অনেক দরকার হইল শীতলাকে শীতল করিতে। সময়ও লাগিল কম নয়। শীতল হইয়াও শীতলা বলিল, ইচ্ছে করে নয় তো কি? দিব্যি নেমে এল ওপোর থেকে, একটু হোঁচট পর্য্যন্ত লাগল না একবার, আর আমার গায়ের ওপর উঠে দাঁড়াবার বেলা—

সনাতন অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, শোনেন বেয়ান, শোনেন। ব্যাপার কি জানেন? অনেককাল এ-বাড়ীতে চলাফেরা করছি কি-না, দেখতে না পেলেও চলে-ফিরে বেড়াতে পারি; আমার অজান্তে কোথাও কিছু পড়ে থাকলে কিন্তু মাঝে মাঝে হোঁচট খাই, মাড়িয়ে দি'। এবার জানতে পেলাম আপনি কোনখানে শুয়ে আছেন, দেখবেন আর কখনও আপনার গায়ে গিয়ে পড়ব না। ইস্! হাঁটুর বদলে মুখটা যদি মাড়িয়ে দিতাম আপনার! কি আপ্‌শোষের কথাই তা হলে হ'ত! মোহিনীর কাছে শুনেছি তো আপনার কথা সব। এমন ভালমানুষ আপনার মত আর সংসারে আছে?

শীতলা খুসী হইয়া বলিল, যাকগে' ও কথা, দেখতে পেলে কি আর ও-রকম করতেন ? কেমন আছি জিগ্যেস করছিলেন, আমার আবার থাকাথাকি, বাতে একেবারে সেরেছে আমাকে, না পারি উঠতে না পারি—

সনাতন বলিল, আর উঠতে পারা না পারা। চোখ দুটো গিয়ে থেকে আমার ওঠা না ওঠা সব সমান হয়ে গিয়েছে। আন্দাজে আন্দাজে মানুষ আর কাঁহাতক—

শীতলা বলিল, আর বছরও এতটা বাড়ে নি, এ-বছর বর্ষা নামতে—

একজন বাতে পঙ্গু, একজন অন্ধ। নিজের কথা বলার আগ্রহ বনাম পাগলামী দুজনেরই থাকা স্বাভাবিক। তবে এ রোগটা সনাতনের দেখা দিয়াছে আজ। এক নিশ্বাসে যতগুলি কথা বলা যায় তাও শীতলা বলিতে পাইতেছিল না, নিশ্বাস শেষ হইয়া আসিলে একটা রোমাঞ্চকর গভীর শ্বাস টানার সুযোগ পাওয়া ত দূরের কথা।

সনাতন বলিল, তবে একটা দয়া ভগবান করেছেন, চোখ দুটো গিয়েছে আমার কানে। পিঁপড়ে চললে শুনতে পাই। ঘরের জিনিসপত্র এ্যাদ্দিন নইলে কি কিছু থাকত ? সব চুরি হয়ে যেত না ? কানের জন্য সব বজায় আছে, চুরির মতলবে কেউ ঘরে আসুক অমনি বলে দেব কে এল, কেন এল।

মোহিনী ও গিরিজা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। কথা শেষ করিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া সনাতন একটু হাসিল। ভদ্রতার নিরীহ হাসি কিন্তু মুখভরা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল থাকায়

হাসিটা দেখাইল বিশ্রী,—ভ্যাংচানোর মত। ঘাড় কাত করিয়া শুনিবার মত ভঙ্গী করিয়া বলিল, নিশ্বাসের শব্দে মানুষ চিনি বেয়ান। ঘরে একটি ছোট মেয়ে আছে, নয়? কি নাম গো তোমার খুকী।

খুকী সত্রাসে বলিল, আনু।

শীতলা বলিল, আনু? কেউ জিগ্যেস করলে অনিমা বলতে বলেছি হাজারবার—আনু? এ লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে নিয়ে, জানেন বেয়াই—

সনাতন চাপা গলায় বলিল, চুপ।

লোকটার ভঙ্গী দেখিযা শীতলা থ বনিযা গেল। অদ্ভুত হাস্যকর কান পাতিয়া শ্রবণাতীত কি একটা শব্দ সে যেন শুনিবেই, ভগবানের চোখের দৃষ্টি কানে দেওযাব দযাকে ব্যর্থ হইতে দিবে না মাথা কাত করিয়া, মুখের চামড়া কুঁচকাইয়া, অদ্ভুত অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে কি সেই দৃশ্যমান শোনার প্রক্রিযা!

একটু ভযে ভযেই শীতলা বলিল, কি হল বেযাই?

সনাতন ফিস ফিস করিয়া বলিল, একটা বেড়াল এসেছে না ঘরে, কালো একটা বেড়াল? রোজ ব্যাটা মাছদুধ খেযে যায়। একেবারে পাত থেকে তুলে নিয়ে পালায়, কাণা মানুষ কি না গ্রাহ্যও কবে না। আচ্ছা করে ব্যাটাকে একদিন মারতে পারলে—

অন্ধের হাতে যে লাঠি থাকে তার নাম অন্ধের নড়ি। হঠাৎ সেটা তুলিযা অনাগত অদৃশ্য ও কাল্পনিক কালো বিড়ালটিকে সনাতন এমন মারিয়া বসিল যে শাদা-কালো চুলে ঢাকা শীতলার মাথাটা প্রায় ফাটিয়া গেল; অন্ততঃ তাই মনে হইল শীতলার ঘর

ফাটানো আর্ত্তনাদে। আগে শীতলার ভয়ানক লাঞ্ছনায় মাথা ফাটিত না বলিয়া মোহিনী কাঁদিত শুধু মৃদুস্বরে, মাথা না ফাটিয়া থাকিলে এমন চীৎকার শীতলা কোন যুক্তিতে করিবে ?

তবে যুক্তি মানার মত অভিজাত মহিলা শীতলা নয়। তাই শেষ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল, মাথাটা তার ফাটে নাই, শুধু চামড়া ফাটিয়া গিয়াছিল কপালের, অনেক রক্ত পড়িয়াছিল আর বেজায় ফুলিয়াছিল। বিড়ালের বদলে মাননীয়া বৈবাহিকার মাথায় লাঠি মারিয়া বসিয়াছে শুনিয়া সনাতন যে হা-হুতাশ আরম্ভ করিয়াছিল সেটা আন্তরিক কি না ঠিক বলা না গেলেও অন্যান্য বিষয়ে তার আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না কারও।

শীতলার কপালের ফুলা কমিয়া ব্যথাও যখন প্রায় মিলাইয়া আসিযাছে তখনও সনাতনের অনুশোচনা কমিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, সময় নাই, অসময় নাই, শীতলার ঘরে আসিয়া হাজির হয়, মরণাপন্না রোগিণীর সঙ্গে কথা বলার মত গলার সুর করিয়া জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছেন বেয়ান ?

তিন চার দিন অভিশাপ দিয়াও সনাতনকে কাবু করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ-মনে শীতলা ক্ষান্ত হইয়াছিল। তাছাড়া, যতদিন না মরিবে এ বাড়ীটাও সনাতনেরই। শীতলা তাই মনের সাধে অন্ধ মানুষটাকে মুখ ভ্যাংচাইয়া বলে, বেশ আছি, খাসা আছি, দিব্বি আছি।

সনাতন বলে, বেশ, বেশ বিড়েল মারতে গিয়ে আপনাকে মেরে অবধি জানেন বেয়ান, মনে একদণ্ড শ্বস্তি নেই।

আন্নু বলে, ও-রকম মুখ করছ কেন জেঠিমা, কষ্ট হচ্ছে ?

সনাতন বলে, ফুলোটা বুঝি কমেনি এখনো ? দেখি একবার—

অন্ধের দেখা মানে হাতড়ানো। শীতলার চোখে তাতে আঙুলের খোঁচা লাগিয়া যায়। বেশ জোরেই লাগে। আবার চেঁচায় শীতলা, দেখিতে দেখিতে চোখটা হয়ে যায় টকটকে লাল, গিরিজা ও মোহিনী ছুটিয়া আসে। গিরিজা ভৎর্সনার সুরে বলে, কি যে করেন আপনি বুঝতে পারি না কিছু।

সনাতন প্রচণ্ড দুঃখের সঙ্গে বলে, চোখ দুটো গিয়ে থেকে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবা, চোখে না দেখতে পেলে মানুষ সংসারে বাঁচতে পারে ? কেন যে এমন শাস্তি আমার অদেষ্টে জুটল। সময় সময় আমার কি সাধ যায় জান গিরিজা ? সাধ যায় লোকালয় ছেড়ে বনে-জঙ্গলে কোথাও চলে যাই, এমন করে বেঁচে থেকে কি হবে !

সনাতনের কথা শুনিলে চোখে জল আসে। আহা, তাইতো, সে যে অন্ধ ! শীতলার খোঁচা লাগা চোখ দিয়া দরদর করিয়া যে জল পড়ে, মনে হয় সে যেন সমবেদনার অশ্রুধারা। তার হাঁটু মাড়ানো, কপালে লাঠি মারা আর চোখে খোঁচা দেওয়ার অপরাধ-গুলি সনাতনের যেন কিসে এবং কি ভাবে ধুইয়া মুছিয়া সাফ হইয়া যায়, আড়াল হইয়া যায় সনাতনের পাহাড়-সমান দুঃখের পিছনে।

মোহিনী গোপনে স্বামীকে বলে, আহা, একে তো অন্ধ হয়েছেন, তারপর আবার এ সব করে বসছেন। সত্যি, বাবার যে কি অদেষ্ট ?

সকলে চলিয়া গেলে শীতলার চোখে জল পটি দিতে দিতে আহু

বলে, তালুই মশায় ডাকাত জেঠিমা। দেখলে আমার এমন ভয় করে।

শীতলা বলে, এক কাজ করতে পারিস আন্নু? সিঁড়ি দিয়ে যখন নামতে যাবে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারিস একদিন? নয় তো, সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকবে মাথায় একটা খান ইট মেরে পালিয়ে আসতে পারিস? ওতো আর দেখতে পাবে না কে মারল! আমি বলব তুই সারাক্ষণ আমার কাছে ছিলি, এক মিনিটের জন্যেও যাসনি কোথাও। পারবি?

আমার ভয় করবে জেঠিমা।

মর তুই ভীরু হাবা মেয়ে।

ডাকাত তালুই মহাশয়কে দেখিয়া আন্নুর অকারণ ভয় সকারণ কৃতজ্ঞতায় তলাইয়া যায়। সনাতনের মধ্যে যত কিছু ভীতিকর, এক হিসাবে সে সব হইয়া দাঁড়ায় তার বর্ম। সকলের, বিশেষ করিয়া মোহিনীর আক্রমণগুলি যাতে ঠেকিয়া থামিয়া যায়, আন্নুর নাগাল পায় না।

প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া থাকার বৈজ্ঞানিক শাসনে মোহিনী শাশুড়ী-ননদের কাছে একদিন যা পাইয়াছিল, এখন আন্নুকে তা ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করে। কথা বলে কড়া সুরে, শাসন করে চড়া মেজাজে, বিচার বিবেচনার ধার ধারে না। বাধা দেয় সনাতন।

বলে, আহা, কেন মারছিস মোহিনী?

বলে, আঃ গাল দিচ্ছিস্ কি জন্তে শুনি?

বলে, ধুত্তোর! অত বড় মেয়েকে মারতে যাস, তোর লজ্জা নেই মোহিনী?

সনাতনের বলাতেই আন্নু বাঁচিয়া যায় আর কৃতজ্ঞ হয় সনাতনের কাছে, আর বেশী বেশী সেবা করে সনাতনের। অনেক সময় শুধু সনাতনের নাম দিয়াই মিথ্যা কৈফিয়তের আড়াল রচিয়া নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টাও আন্নু করে।

মোহিনী বলে, ধিঙ্গি মেয়ে, তুই থাকিস থাকিস যাস কোথা হতচ্ছাড়ী। ভাত যে এদিকে পোড়া লাগল—

আন্নু বলে, তালুই মশায়ের ঘাড়ে ব্যথা হয়েছে, আমায় বললেন একটু টিপে দেত মা আন্নু, তাইতো আমি—

ফের মিছে বলছিস! বাবার ঘরে ছিলি তুই আর ডেকে ডেকে আমার গলা চিরে গেল শুনতে পেলি না? চল তো বাবার কাছে জিগ্যেস করি। মিছে কথা হলে পিঠের চামড়া তোর—

আন্নু তা জানে। ভাত পোড়া লাগা আর মিছে কথার সমন্বয়ে পিঠের চামড়া কারো আস্ত থাকা সম্ভব নয়। তাই সনাতনের ঘরে ঢুকিয়া মোহিনী মুখ খুলিবার আগেই সে গড় গড় করিয়া বলিয়া যায়, আচ্ছা তালুই মশায়, আপনার ঘাড়ে ব্যথা হয় নি? আমি এতক্ষণ টিপে দিই নি আপনার ঘাড়? বৌদি ডাকছিল শুনতে পেয়েছিলাম আমরা? বৌদি বলছে মেরে আমার—সনাতন হাঁকে, মোহিনী! মোহিনী!

আন্নু হাঁফ ছাড়িয়া বলে, এই যে বৌদি এখানে তালুই মশায়।

সনাতন বলে, মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলিস না মোহিনী,

জ্যান্তে মরে থাকবি শেষকালে। আমার এ দুর্দ্দশা কি জন্যে? তোর মাকে—দেতো ঘাড়টা একটু টিপে দেতো আমার।

সনাতন চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, মোহিনী আস্তে আস্তে তার ঘাড় টিপিয়া দেয় আন্নুর দিকে মাঝে মাঝে তাকায় মোহিনী। কত কথা, কত গাল মন্দই যে মানুষের চোখ বলিতে পারে।

আন্নুব ভয় হয়, ভাবনা হয়। একটু ভাবিয়া সে বলে, আমি টিপে দিচ্ছি বৌদি, তোমার ঘাড় ব্যথা করবে।

মোহিনী কথা বলে না।

আন্নু আবার বলে, খোকা যদি কেঁদে ওঠে বৌদি? তুমি বরং নীচে যাও।

মোহিনী বলে, চুপ কর তুই। ফফরদালালিতে কাজ নেই।

এবার সনাতন বলে, হাতে তুই বালা পরেছিস, না মোহিনী? ঘাড়ে তাই লাগছে। যা, তুই নীচেই যা।

বালায় ঘাড়ে লাগে না মানুষের, আঁটো বালা খুলিতে গেলে হাত ছুলিয়া যায়। খুব কি লাগিয়াছিল সনাতনের স্ত্রীর বালা কাড়িয়া নেওয়ার সময়? লাগিয়া থাকিলেও সে কি সনাতনের দোষ? এমন স্বামী জগতে কে আছে যে স্ত্রীর কোমল হাত দুটি অক্ষত রাখিয়া আঁটো বালা গায়ের জোরে কাড়িয়া নিতে পারে! এমন স্ত্রীও কি এ-জগতে আছে মারধোর করিয়া স্বামী গয়না কাড়িয়া নিলে যে পলাইয়া যায় আর মরিয়া যায়? এমন মেয়েও কি কারও থাকে যে মেয়েমানুষকে মারে আর বাপের ঘাড়ে বালা দিয়া আঘাত করে? সবই আশ্চর্য্য এ-জগতে, সবই অদ্ভুত! খাপ-ছাড়া তলোয়ারের মত একদিকে ধার একদিক ভোঁতা। ভাবিয়া

ছ্যাখো কথাটা। তাই যদি না হয়, বালা পরার জন্য মেয়েকে কেউ ঘেন্না করে? শুধু বালা পরার জন্য?

সনাতন বলে, আন্নু, ওমা আন্নু!

আন্নু বলে, কি বলছেন, তালুইমশায়?

হাতে তুমি কি পরেছ, আন্নু? বালা নয় তো?

না, তালুইমশায় কাচের চুড়ি।

বেঁচে থাকো মা, লক্ষ্মী মেয়ে।

গিরিজা বড় কৃপণ, টাকার জন্য মোহিনীর বড় দরদ।

ইতিমধ্যে মোটে দুবার সনাতনকে কিছু টাকা দিয়াই ওরা আর উপুড়হস্ত করিতে চাহিতেছে না। একদিন মেয়ে জামাইকে কাছে ডাকিয়া সনাতন বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, এ-রকম অন্যায় করা কি তাদের উচিত? এ-বাড়ীতে আসিয়া থাকিতে দিয়া ওদের কত বছরের বাড়ী ভাড়া সে বাঁচাইয়া দিয়াছে সে খেয়াল কি ওদের আছে? মাঝে মাঝে তাকে পাঁচ দশটা টাকা দিতে ওদের প্রাণে সহিতেছে না।

গিরিজার মধ্যে এ ধরণের চালাকি বেশ চোখা হইয়া উঠিয়াছে। সে বলে টাকা পেলেই আপনি যে ওসব ছাইপাঁশ খান। আপনার যে-রকম শরীরের অবস্থা তাতে—

সনাতন বলে, টাকা দেবার নামেই আমার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে তোমার দুর্ভাবনা গজিয়ে উঠল, আগে ত ছিল না বাপু? তবু হিসেব তোমার ভুল হয়েছে বাবা, অতি চালাক কি না। ছাইপাঁশ খেলে দু'এক বছরের মধ্যেই আমি পটল তুলব, না খেলে বিশ বছর বাঁচব আরও,—এটা খেয়াল করেছ?

গিরিজার চেয়েও মোহিনী চালাক। সে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলে, অমন করে বললে তোমাকে কি করে টাকা দেব বাবা? তুমি কি ভাব আমরা চাই তুমি তাড়াতাড়ি মরে যাও? তোমার সেবা-যত্ন করব বলেই না আমরা—

সনাতন হাত বাড়াইয়া মেয়ের চোখের তলাটা পরীক্ষা করিয়া বলে, তুই যখন কাঁদিস্—তোর চোখ দিয়ে বুঝি জল পড়ে না মোহিনী?

শুনিয়া মোহিনীর আটকাইয়া আসে দম, গিরিজার মুখটা হইয়া যায় হাঁ। আর তাহারা কথা বলিতে পারে না।

সনাতন ধীরে ধীরে বলে, তা ছাড়া, কি জান গিরিজা, ছাই-পাঁশ না খেতে পেলে আমি লোকজন সইতে পারি না, আমার একা থাকতে ইচ্ছা হয়, খালি বাড়ীতে—স্পষ্ট বলে দিলাম বাপু, বুঝে-সুজে কাজ করো।

তারপর দশটা টাকা আনিয়া গিরিজা শ্বশুরের হাতে দেয়, ক্ষুব্ধস্বরে বলে, আপনাকে দরকার মত টাকা দিতে কি আমার ইচ্ছে করে না বাবা? কি করব বলুন, একেবারে উপার্জ্জনপত্র নেই। আদালতে মোকদ্দমা যা কমে গেছে এবছর, লোকে খেতে পায় না—

সনাতন বলে, লোকে খেতে না পেলেও আদালতে মোকদ্দমা কমে না বাপু। তুমি মামলা পাও না তাই বল, আদালতের দোষ দিও না।

এক মুহূর্ত থামে সনাতন। নিজের বুকে একবার হাত বুলায়। চেনা মানুষের কলঙ্কের কাহিনী বলার মত গলা নামাইয়া

ফিস ফিস করিয়া বলে, নিজের দোষ দেখতে শেখো, গিরিজা নিজের দোষ স্বীকার করতে শেখো। শিখে অনুতাপ কর। অনুতাপ আরম্ভ করলেই দেখবে জীবন আর নিশার স্বপন নয়, বড় মজাদার। যে অনুতাপের জ্বালায় জ্বলে না তার জীবনটাই বৃথা।

গিরিজা বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কতলোকে দোষ করে, পাপ করে, কিন্তু দোষ কবা পাপ করাই সার! অনুতাপ কবার জন্যেই যে ওসব করা এটুকু কাণ্ডজ্ঞানও নেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আনু আসিয়া বাধা দেয়।

দশটায় খাবেন বলেছিলেন দশটা বেজে গেছে দাদা।

গিরিজা মুখ খিচাইয়া বলে, বেজে গেছে দাদা। বাজবার আগে বলতে পাব নি?

সনাতন বলে, নিজের দোষে আবার পরকে বকলে? আমি অন্ধ মানুষ আমি নিজের দোষ দেখতে পাই, তুমি কেন পাওনা বাপু? দোষ করলেও মেয়েমানুষকে বকতে নেই গিবিজা, গলায ভাত আটকে যায়।

গিরিজাব তা আটকায না, নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া সে আদালতে চলিযা যায়। সনাতন বসিযা বসিযা ভাবে। বেলার আন্দাজ সনাতনেব নিখুঁত বারটার সময় সে হাঁকে—আনু ওমা আনু?

কি বল্‌ছেন তালুই মশায?

এবার চান করব, আনু।

চলুন।

স্নানের চেয়ে আহারের হাঙ্গামা সনাতনের বেশী। ভাতের থালা দোতলায় বহিয়া নিয়া যাইতে হয়, হাত ধরিয়া একে একে জলের গেলাস, ডালের বাটি, মাছের বাটি, থালায় ভাত তরকারী ছোঁয়াইয়া, ছোঁয়াইয়া চিনাইয়া দিতে হয়, কাছে বসিয়া মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হয় খাওয়া। যথাসময়ে লেবুর রস নিঙড়াইয়া দিতে হয়, কাপড়ে ভাত পড়িলে ঝাড়িতে হয়, মাছের বাটির জন্ম হাতড়াইতে আরম্ভ করিলে কব্জি ধরিয়া আবার সেটাকে স্পর্শ করাইয়া দিতে হয়।

আন্নু, ওমা আন্নু।

কি বলছেন তালুই মশায় ?

কোন শালী আজ ডাল রেঁধেছে ?

আমি রেঁধেছি তালুই মশায় ?

তুমি রেঁধেছ ? ছি ছি আগে বলতে হয়। কি বলে ফেললাম ছাখো দিকি ! রাম রাম, তুমি যে আমার মেয়ে। কিছু মনে কোরো না।

আন্নু প্রথমে শুধু মাথা নাড়ে, তারপর বলে, না, জেনে তো বলেন নি।

সনাতনও মাথা নাড়ে, না জেনে বললেও দোষ হয় আন্নু। বললেই দোষ হয়। আমার সন্দেশ কই ?

সন্দেশ তো নেই আজ।

দুধের বদলে সনাতন দুটি করিয়া সন্দেশ খায়, একেলা দুটি ওবেলা দুটি। দুধে তার বমি আসে।

নেই! সন্দেশ নেই! কোন বজ্জাত আমার সন্দেশ খেল? মোহিনী! এই মোহিনী! ওলো কালী-মোহিনী!

বৌদির মাথা ধরেছে, তালুই মশায় শুয়েছে।

শুয়েছে? জন্মের মত শুক্!

জন্মের মত যে শুয়েছে সেও সনাতনেব হাঁক শুনিয়া শুইয়া থাকিতে পারে কিনা সন্দেহ। সনাতন আর একবার হাঁক আরম্ভ করিবার আগেই আসে মোহিনী। কি ব্যাপার? সন্দেশ নাই? কে বলিল সন্দেশ নাই! মোড়ের দোকানী রোজ সন্দেশ পাঠাইয়া দেয়, রোজ মোহিনী যত্ন করিয়া সন্দেশ তুলিয়া রাখে, বলিলেই হইল সন্দেশ নাই? আন্নুর মত মিথ্যাবাদী বজ্জাত—

সন্দেশ আনিয়া মোহিনী সনাতনের পাতে দেয়।

আন্নু বলে, কোথায় ছিল বৌদি?

রোজ যেখানে থাকে।

আমি তো খুঁজে পাই নি।

তা পাবি কেন? জানো বাবা, ছুঁড়ি সন্দেশ নেই বলছিল কি জন্যে? নিজে খাবে বলে। মাথা ধরে আজ একটু শুয়েছি কিনা আমি, বাস আর কোথায় যাবে, যত্ন করে সন্দেশ রাখলাম তোমার জন্যে, তবু সন্দেশ নেই। এমন বেহায়া, হ্যাংলা মেয়ে—

আন্নু ক্ষীণস্বরে বলে, তুমি বললে না বৌদি, আজ সন্দেশ দিয়ে যায় নি?

মোহিনী অবাক!—অন্ধ সনাতনও টের পায় এমনি সশব্দ অবাক।

বললাম? সন্দেশ দিয়ে যায় নি বললাম? তোর কথা শুনলে

গা জ্বলে যায় আন্নু। এমন ছোট মন তোর? দুটো সন্দেশের জন্তে এমনি হ্যাংলাপনা? বাপের জন্মে আমি তোর মত—

সনাতন বলে, তোর না মাথা ধরেছে মোহিনী? যা শো গিয়ে।

মাথাধরা কমেছে।

কমুক। যা, শুবি যা। যাঃ—

মোহিনী যায়।

আন্নু প্রায় কাঁদে। বুক ওঠে নামে আন্নুর, ঠোঁট কাপে, চোখ ছল ছল করে—বেশ দেখায় আন্নুকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না কাঁদিয়া নাক সিটকানোর দরুণ মুখের বিষণ্ণতার শ্রীটুকু নষ্ট হইয়া যায়, অকথ্য রকমের বিশ্রী দেখায় আন্নুকে, এসব কিছুই সনাতন দেখিতে পায় না। কেবল নাক সিটকানোর পর আন্নুর জোরে নাক-টানার শব্দে অনুমান করে। বলে, আন্নু, ওমা আন্নু? সব জানি আমি, আমার মেয়েটা মিথ্যুক। ওই আমার সন্দেশ গাপ করার ফিকিরে ছিল। একদিন দিয়ে, দুদিন না দিয়ে, আস্তে আস্তে শেষে একদম বন্ধ করে দিত। তুমি কিছু মনে করো না মা। শুধু ওর গালমন্দ শুনে নয়, যে যা বলুক সব হেসে উড়িয়ে দিও। তুমি আর আমি ছাড়া এবাড়ীর সব ক'টা পাগল, সব-ক'টার মাথার ছিট আছে। তোমার মা ঐমা যখন বেঁচে ছিল—

এমনভাবে কথা বন্ধ করে সনাতন যে তার দু'পাটি দাঁতে খট করিয়া শব্দ হয়। দাঁতের গেট বন্ধ করিয়া সে যেন কথাগুলিকে ভিতরে আটকাইয়া রাখে।

আন্নু বলে, তালুই মশায়, সন্দেশ খেতে আমার বমি আসে।

বৌদি তা জানে তবু আমায় দুষল। আমি এবার মরব বিষ খেয়ে।

শুনিয়া কি বিবর্ণই যে হইয়া যায় সনাতনের মুখ। সভয়ে, গলায় আটকাইয়া যাইতে পারে এমন গাঢ়স্বরে সে বলে, না আন্নু না, কখনো বিষ খেয়ে মরো না মা, কক্ষণো নয়। এমনিও মোরো না মরতে কি আছে? তুমি একা মবলে একজন দু'জন চারজন কতজনকে জ্যান্ত মেরে রেখে যাবে তার কি ঠিক আছে! অমন কথা মনেও এনো না বাছা। কিসে কি হয সে জ্ঞান কি তোমার আছে, ছেলেমানুষ তুমি? লক্ষ্মী হয়ে শান্ত হয়ে থেকো, দেখবে তোমার মত সুখী কেউ নেই। তা না করে যদি মরে যাও বিষটিষ খেযে—

বিষ খাইয়া মরিলে যে সুখী বা দুঃখী হওয়ার প্রশ্ন শেষ হয় একথা মনে পড়ায় সনাতন থামিযা যায না, আন্নুকে সে তো যুক্তি-তর্কের কথা বলিতেছিল না। আন্নুকে এসব কথা বলিতে নাই বলিয়াই সে থামে। এসব বক্তৃতা কি এতটুকু মেযেকে শোনাইতে আছে!

খানিকক্ষণ ঝিম ধরিয়া থাকে সনাতন, তারপর অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, কি বলতে গিয়ে কি সব বলছিলাম তোমায, তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে আন্নু, বড় ভাল মেয়ে তুমি—আন্নু? চলে গেছো নাকি?—আন্নু, ওমা আন্নু!

কি বলছেন তালুই মশায়?

এবাব আঁচাব।

সন্দেশ খান?

খাই নি সন্দেশ ? কি পোড়া মন হয়েছে আমার !

সন্দেশ খাইয়া আঁচাইয়া সনাতন উপরে যায়। খাটে বসিয়া চুপচাপ ভাবিতে থাকে। ভাবিতে ভাবিতে রাগ হয় সনাতনের, রাগ হইতে হইতে মাথা গরম হইয়া ওঠে।

ঘর ফাটাইয়া সে হাঁক দেয়, আন্নু, ও আন্নু! মোহিনী! ওলো মোহিনী !

দুজনেই সাড়া দিয়া ঘরে আসে।

সনাতন বলে, আন্নুকে তুই বকিস কেন লো মোহিনী, কেন যা'তা বলিস ? সন্দেশ চুরির মতলব করবি তুই, আর গাল দিবি ওকে ! ফের যদি এরকম করবি তো দূর দূর করে বাড়ী থেকে খেদিয়ে দেব তোকে—গলা ধাক্কা দিয়ে খেদিয়ে দেব।

রাগে দুঃখে আর অপমানে মোহিনী কাঁদিয়া ফেলে। ফুপাইতে ফুপাইতে বলে, ওর কথা শুনে ওর সামনে আমাকে তুমি এমনি অপমান করবে বাবা ? ওর কথা বিশ্বেস করে আমাকে অবিশ্বাস করবে ? আমি ওর গুরুজন, মায়ের মত আমি ওকে খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি মানুষ করছি, এমনি ভাবে ওর কাছে আমার মাথা হেঁট করাবে ? আমি তোমার মেয়ে, ও তোমার কে।

সনাতন বলে, আন্নু, ওমা আন্নু ?

আন্নু বলে, কি বলছেন তালুই মশায় ?

মোহিনীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে ?

পড়ছে তালুই মশায়।

সনাতন হঠাৎ খুব শান্ত হইয়া যায়। স্বাভাবিক চড়া গলা ঝাপ্সা হইয়া আসে। মেয়েকে কাছে ডাকিয়া তার গায়ে মাথায়

হাত বুলাইতে আরম্ভ করে সনাতন। আহা! ওর মা যখন ওকে ফেলিয়া চলিয়া যায়, ওর বয়স ছিল মোটে সাত বছর। মার জন্য কি কান্নাই তখন মোহিনী কাঁদিত! ঝর ঝর করিয়া কি জলটাই ঝরিত দু'চোখ দিয়া! মোহিনীর গলাব হারে হাত পড়ায় সনাতন চমকাইয়া ওঠে। মেয়ের একটা হাত তুলিয়া চুড়ি ও বালা স্পর্শ করিয়া হাতটা সে ছুঁড়িয়া দেয়। গয়না! গয়নাব শোকে যে স্বামী সন্তানকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিযাছিল তাব মেয়ে কত গয়না পরিয়াছে ন্যাখো। নিলর্জ্জ বেহায়া মেযে!

যা তোরা। যা এ-ঘর থেকে।

আন্থু ও মোহিনী চলিয়া গেলে একা একা খানিকক্ষণ ঝিমায় সনাতন, খানিকক্ষণ বিড় বিড় করিয়া আপন মনে বকে, খানিকক্ষণ ছটফট করে। তারপর হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া আলমারি খুলিয়া একটা বোতল বাহির করিয়া আনে। গেলাস সনাতনের দরকার হয না।

এতকাল দিনের মর্য্যাদা রাখিযাছিল সনাতন, দিন রাত্রির ভেদ ঘুচিয়া যাওয়ার পরেও—কিন্তু কি করা যায। অন্ধ তো শুধু অন্ধই নয়।

চাকরী

গাড়ী নূতন, বৌ নূতন, চাকরী নূতন। চাকরীটা জুটিয়াছে কৌশলে, শোভারাণীকে পাশে বসাইয়া সহরের বাহিরে প্রকৃতির শোভা দেখিতে আর ফাঁকা হাওয়া খাইতে বাহির হওয়াটাও ঘটিয়াছে কৌশলেই। কাল বিকালে বাড়ীর সকলে গিয়াছে এক ভাইপোর বিবাহ উপলক্ষে বর্দ্ধমান, শোভারাণীর বাপের বানানো অসুখের ছুতায় তারা দু'জনে থাকিয়া গিয়াছে। আজ বারাসতে বাপের অবস্থা দেখিয়া হয় শোভা যাইবে বর্দ্ধমান, না হয় শোভা যাইবে না; এই হইয়াছে ব্যবস্থা।

মনটা বড় খুসী ছিল মহেন্দ্রজিতের। মিথ্যার অস্ত্রে দু'দিনের সংক্ষিপ্ত 'হানিমুন'টুকু আয়ত্ত করার জন্য যতটা নয়, চাকরীটার জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী। থাকিয়া থাকিয়া অকারণেই সে হর্ণটা টিপিয়া দিতেছিল প্যাঁক, প্যাঁক। মন খুব খুসী থাকিলে শ্বশুরদত্ত গাড়ীর হর্ণ টিপিতে যেন মজা লাগে।

চাকরীর জন্য মনটা খুসী আছে এ-কথাটা বলিতে শ্বশুর-দত্ত বৌটি কিন্তু মুখ বাঁকাইয়া হাসিল।—'ভারি তো চাকরী তার জন্য আবার আনন্দ! নাই বা করতে তুমি চাকরী? একমাস খেটে একশটা টাকা—পুৎ!'

কোঁচকানো ঠোঁটের 'পুৎ' মহেন্দ্রজিৎকে আরও খুসী করিয়া দিল। সে হাসিয়া বলিল, 'প্রথমেই লোকে বুঝি হাজার টাকার চাকরী পায়? থাক বাড়ীর মধ্যে, চাকরীর বাজারের ব্যাপার তুমি কি জানবে! তাও বাবার জন্যে পেলাম, বাবা ব্যবস্থা না করলে ভূষণবাবু আমায় কলা দেখিয়ে বিদেয় করে দিতেন। একশ'তে ঢুকলাম এখন, দু'এক বছর যাক,

কাজকর্ম্ম শিখি, আস্তে আস্তে ভূষণ বাবুই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'যদি না করেন?'

'থাবেন কোথা না করে? আমার জন্যে উনি কিছু না করলে ওর ছেলের জন্যও বাবা কিছু করবেন না, কলা দেখিয়ে দেবেন।'

কথায় কথায় 'কলা দেখান'টা মহেন্দ্রজিতের মুদ্রাদোষ। আরও কিছুদিন পরে শোভারাণী হয় তো একেবারেই খেয়াল করিবে না, এখন মাঝে মাঝে তার হাসি পায়।

'কলা, কলা, কলা! মাগো মা, কি কলাটাই তুমি দেখাতে পার।—আচ্ছা, এমনি ভাবে একজনের ছেলেকে আর একজনের আপিসে না নিয়ে, যার যার ছেলেকে নিজের নিজের আপিসে নিলেই তো হ'ত?'

সরল হাসি ও সরল প্রশ্নে মহেন্দ্রজিতের ভর্ত্তি বুকটা আরও কিসের আবির্ভাবে যেন ছাপাইয়া গেল। নূতন গাড়ীটার স্বচ্ছন্দ গতির চেয়েও সহজ ও আরামপ্রদ গতিতে কি আনন্দেই এই স্ত্রীর সঙ্গে আগানো চলিবে জীবনের পথে! গাড়ীর গতিবেগ সে শ্লথ করিয়া আনিল।

"তাই কি হয়? যা তা বলত না লোকে? দুজন ডিরেক্টর বাবাকে পছন্দ করে না, তারা গোলমাল করত। তা ছাড়া এর পর যখন ওপরে ওঠাতে হবে তখন? কত লোক আছে আপিসে, তাদের ডিঙিয়ে শুধু নিজের ছেলেকে—'

কথাটা সে শেষ করিল প্রাণ-বাঁচানোর বদলে রাস্তার একটা কুকুরকে বিশ্রী একটা গাল দিয়া। গালটা শুনিয়া শোভারাণী

মুচকিয়া একটু হাসিল। সহরের শেষপ্রান্তও তারা কিছুক্ষণ আগে পার হইয়া আসিয়াছে। এদিকে মহেন্দ্রজিৎ আগে আর কখনও আসে নাই। মোটর হাঁকাইয়া বেড়ানোর ফ্যাসন প্রচলিত করার আভিজাত্য এ পথটির নাই, সে রকম প্রশস্তও নয় পথটা, কিন্তু ভারি নির্জ্জন। কয়েকটা সাধারণ গ্রাম পার হওয়ার পর গরীবদের সহরতলীর খানিকটা ছিটকানো অংশের মত একটা গ্রাম পাওয়া গেল। শরৎকালের শিশু-সূর্য্যের কিরণ দামী সোণার বর্ণচ্ছটার মত দু' পাশের ঘরবাড়ীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যে সব বাড়ীতে মেয়েদের গায়ের দু' চারখানা গয়না ছাড়া কমদামী সোণারও বড় অভাব। ডাকাতি রাহাজানির ভয়ে শোভারাণী গা'এর অনেক সোণা বাড়ীতে খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। গায়ে তার যে সোণা আছে, একা একা স্বামীর পাশে বসিয়া মোটরে হাওয়া খাওয়ার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট, কিন্তু মনের ভুলে সরু চেন-হারটির বদলে বিছা-হারটি না পরিয়া আসায় মনটা বড় খুঁত খুঁত করিতেছিল শোভারাণীর। পথের পথিক, বিশেষত, দু' পাশের বাড়ীর মেয়েরা কেউ কেউ মুহূর্ত্তের জন্য হইলেও, দেখিতে তো পাইতেছে তাকে। এই সরু ছোট বাজে হারটা নজরে পড়িলে না জানি কি ভাবিতেছে তারা!

'জান, মনটা খুঁত খুঁত করছে। বিছে-হারটা পর্য্যন্ত পরে আসতে ভুলে গেছি। এমন খালি খালি লাগছে গলাটা!'

মহেন্দ্রজিৎ পরিহাস করিয়া বলিল, 'ভালই হয়েছে, বিছে-হার যদি কামড়ে দিত?'

শোভারাণী অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'তুমি তো ঠাট্টা করবেই,

নিজে তো দিব্যি সোণার ঘড়িটি লাগিয়ে এসেছ বিয়ের।—ও মা! ঘড়িটাও যে আনিনি আমি! কি হয়েছে আমার আজ? হাতটাও তাই এমন খালি খালি লাগছে!'

বিছা-হার ও হাত-ঘড়িটি না আনার আপশোষ ফুরাইবার আগেই গ্রাম ফুরাইয়া গেল। কিন্তু, একটা লাইট রেলওয়ের লাইন পার হওয়ার পর দেখা গেল গ্রামটির এতদূর তফাতে একটি গ্রামতলী গড়িয়া উঠিয়াছে। ভিন্ন একটা গ্রামই হয় তো হইবে, কিন্তু এমন অসম্বন্ধভাবে পাড়া কয়েকটি ছড়াইয়া আছে, ক্ষেত, আমবাগান প্রভৃতির ব্যবধানে এমন কতগুলি ছাড়া ছাড়া বাড়ী আছে যে, গ্রামতলী সংজ্ঞাটিই মানায় ভাল। এমনি একটি প্রায় নিঃসঙ্গ ইট-বাহির-করা ছোট একতলা বাড়ীর সামনে পাঁচ-কোণা ছোট বাগানটির চিকলি চারার বেড়ার গায়ে বসানো বাঁশের বাতা দিয়া তৈরী গেটটি ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া একজন প্রায় ছ' ফুট লম্বা যুবক বিড়ি টানিতেছিল। সম্মুখ দিয়া মোটরটা হুস্ করিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় মুখ হইতে বিড়িটা নামাইয়া সে এমন একটা অদ্ভুত মুখ-ভঙ্গী করিয়া শোভারাণীকে একটা থাপছাড়া নজর দিল যে, গলা ও বাঁ হাতের কব্জির শূন্যতা যেন বিছার মতই কামড় দিতে লাগিল তাকে।

মহেন্দ্রজিৎ বলিল, 'ওর বাড়ীটা যে এদিকে, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'কার বাড়ী?'

'জয়গোপালের। ঐ যে লম্বা-মত ছেলেটা দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল,—ও। ওর কাছেই তো চাকরীটার খবর পেয়েছিলাম। বাবাও জানতেন না ভূষণবাবুর আপিসে লোক নেওয়া হবে।

বাবার একটা চিঠির জন্ম জয়গোপাল আমার কাছে গিয়েছিল। আমি তো নিয়ে গেলাম বাবাব কাছে, বাবা শুনেই ওকে কলা দেখিযে বললেন, না বাপু, চাকবীর জন্ম আমি কাউকে রেকমেণ্ডেশন লেটার দিই না। বলেই ছুটলেন ভূষণবাবুর কাছে।'

'তোমার বন্ধু বুঝি ও?'

'বন্ধু না ছাই। সেই কবে ছেলেবেলা দু' এক বছর এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছিলাম।'

ফিরিবার সময দুর্ঘটনাটি ঘটিয়া গেল, এই বাড়ীটির সম্মুখেই। মোটর যে হাঁকায, সে-ই জানে কত আশ্চর্য্য রকমের হাঁদা ও অসাবধান মানুষ বাস করে পৃথিবীতে। কিন্তু, এ অভিজ্ঞতা এখনও মহেন্দ্রজিতের জন্মে নাই যে, এমন মানুষও এ জগতে থাকিতে পারে, কয়েক হাত তফাতে সজোরে ও সশব্দে যে গাড়ীটা আসিতেছে, সটান তার সামনে আসিয়া দাঁড়ানের মত সাংঘাতিক দুর্ব্বুদ্ধিতে যার মগজটা ঠাসা। কুকুর, বিড়াল হইলে চাপা দিয়াই সে চলিয়া যাইত, মানুষ, বিশেষত চেনা মানুষ, বলিয়া হঠাৎ সে এমন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল যে, যা সম্ভব ছিল না, করিতে গেল তা-ই। ব্রেক কষিবার সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত বাধাটির পাশ কাটাইয়া যাওয়ার জন্ম ষ্টিয়ারিং-হুইলটাও দিল অনেকখানি ঘুরাইযা। ফলে, জয়গোপালদের চিকলি চারার বেড়া চুরমার করিয়া একটা ডিগবাজী খাইয়া গাড়ীটা স্থিতিলাভ করিল বাগানের মাঝখানে। কাত হইয়া স্থিতিলাভ করার জন্ম দু'টি চাকা উঠিয়া রহিল শূন্যে।

মানুষকে মাঝে মাঝে খুন-জখমের উত্তেজনা সরবরাহ করাও মোটরগাড়ীর একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে। উত্তেজনাটা এমন উপভোগ্য যে, সব সময় জোটে না বলিয়া অনেকে আপশোষ পর্য্যন্ত করে। প্রচণ্ড শব্দ, তীব্র আর্ত্তনাদ, জমজমাট ভীড়, প্রশ্ন, মন্তব্য আর উপদেশের কোলাহল, পুলিশ আর এম্বুলেন্সের আবির্ভাব: রাজধানীর রাজপথে আদর্শ মোটর দুর্ঘটনার এইগুলি প্রধান অঙ্গ। আমাদের এই দুর্ঘটনাটি যদিও ওসব বড় বড় দুর্ঘটনার তুলনায় এক রকম কিছুই নয়, তবু পুলিশ ও এম্বুলেন্সের আবির্ভাব ছাড়া বাকী সমস্তই একে একে গেল ঘটিয়া। শব্দ শুনিয়া জয়গোপালের বাড়ীর সকলে, পাড়ার কয়েক বাড়ীর প্রতিবেশী ও পথের পথিক আসিয়া জোটায় ভীড় জমিল নেহাৎ মন্দ নয়। গাড়ীর ভিতর হইতে দু'জনকে টানিয়া বাহির করার পর বুঝা গেল, কিছু কিছু জখম হইলেও মারাত্মক আঘাত সম্ভবতঃ কারো লাগে নাই। শরীরের অনেক স্থানেই কাটিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে দুজনের; মহেন্দ্রজিতের কপালের একটা ক্ষত হইতে রক্ত ঝরিতেছে বেশী, শোভারাণীর প্রায় বোঁচা নাকটা একেবারে ছেঁচিয়া গিয়াছে।

জয়গোপাল মহেন্দ্রজিৎকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় বেশী লেগেছে, বুঝতে পারছ?'

মহেন্দ্রজিৎ বোকার মত বলিল, 'না।—তুমি অমন ভাবে গাড়ীর সামনে গিয়ে পড়লে কেন?'

এ প্রশ্নের কি জবাব দিত জয়গোপাল, সে-ই তা জানে, দু'জনের হাত-পা কিছু ভাঙিয়াছে কি না, অবিলম্বে সেটা জানিবার প্রয়োজনের তলে প্রশ্নটা চাপা পড়িয়া গেল। তা ছাড়া, চারিদিক্

হইতে যে প্রশ্ন বর্ষিত হইতেছিল, বৃষ্টিধারা হইলে বাগানে বন্যা আসিত। প্রতিবেশী একটি ছেলেকে লাইট রেলওয়ে লাইনের ওপারে অম্বিকা ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া জয়গোপাল নিজের বন্ধুর হাত-পা যতটা পারে নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল, দেহের অন্য কোন অংশ যদি তার গুঁড়াও হইয়া গিয়া থাকে, এই অঙ্গ কয়েকটি আস্তই আছে। শোভারাণীর নাকের যন্ত্রণা কিন্তু তার শরীরের অন্য অংশগুলির অবস্থানির্ণয়ের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। জয়গোপাল বলিল, 'মা, ওঁকে ভিতরে নিয়ে যাও।'

রক্ত দেখিয়াই মা উপক্রম করিয়াছিলেন কাঁদিয়া ফেলিবার, কিন্তু দু'চোখ শক্ত করিয়া বন্ধ করিয়া ফেলায় কান্নাটা পরিণত হইয়াছিল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া থরথর কাঁপুনিতে। ছেলের ডাকে তিনি চোখ মেলিলেন, একবার শিহরিয়া উঠিলেন, তারপর একাই জড়াইযা ধরিয়া শোভারাণীকে তুলিতে গেলেন কোলে। নিজের তিন বছরের ছোট মেয়েটাকে কোলে তুলিতেই যার কষ্ট হয়, শোভারাণীকে তিনি কেন তুলিতে পারিবেন? সেজ মেয়ে কনক ও জয়গোপালের বৌ বীণা সাহায্য করায় তিনটি ক্ষীণাঙ্গী বাহিকার সমবেত শক্তি শোভারাণীর আহত দেহটিকে অন্দরে লইয়া যাইতে পারিল। মহেন্দ্রজিৎ ভিতরে গেল জয়গোপালের কাঁধে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে।

হতভম্ব ভাবটা তার দ্রুত কাটিয়া যাইতেছিল। জয়গোপালের ঘরে চৌকীতে গুটানো বিছানার নীচেকার ময়লা সতরঞ্চিতে বসিয়া হঠাৎ সে ভয়ানক রাগ করিয়া বলিল, 'দেখ দিকি কি

কাণ্ড করলে তুমি! তোমার মত 'কেয়ারলেস্' হাঁদা,—ও কোথায় গেল?'

শাদা জামা-কাপড়ের এখানে ওখানে রক্তের ছাপ, বসিবার ভঙ্গীতে একটা অদ্ভুত অসহায় ভাব, বাঁ গাল বাহিয়া কেঁচোর মত রক্তের রেখাটির আঁকা বাঁকা ধীর নিম্নগতি—এ সমস্তের সঙ্গে তার মুখের এতক্ষণের সকাতর ভয় ও থতমত ভাবটা বেশ মানাইয়াছিল। এবার পর পর এই আকস্মিক ক্রোধ ও উদ্বেগের ছায়া পড়ায় তার মুখখানা যেন তারই নিজস্ব সর্ব্বাঙ্গীণ বিপন্নতার আবেষ্টনীতে অভিনেতার মুখের মত খাপছাড়া হইয়া গেল। স্ত্রীর সম্বন্ধে এতক্ষণ তার কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না খেয়াল করিয়া, জয়গোপালের মুখে যে মৃদু হাসিটুকু দেখা দিল, সেটা কিন্তু দেখাইল আরও বেমানান, আরও অস্বাভাবিক।

'তুমি হাসছ! আমার এমন সর্ব্বনাশ করে তোমার হাসি পাচ্ছে?'

জয়গোপাল মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না ভাই, হাসি নি। হাসব কেন? তোমার স্ত্রীর বেশী লাগেনি।'

'একবার দেখে আসি চল।'

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মহেন্দ্রজিৎ পাশের ঘরে গেল। এ বাড়ীর মধ্যে এই ঘরখানাই একটু সাজানো, যে কয়েকটি দামী জিনিস আছে বাড়ীতে, ঘরে ঘরে ভাগ না করিয়া এই ঘরেই জমাইয়া রাখা হইয়াছে। মেয়েরা বেড়াইতে আসিলে তাই এ ঘরেই তাদের

বসিতে দেওয়া হয়। দেয়ালে ছবি ও ফটো টাঙ্গানো আছে, দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষিয়া পাতা আছে তিনপুরুষের একটি খাট, উত্তরের দেয়াল স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে একটি আলমারি এবং একটা বেঞ্চির উপরে গোটাদুই নূতন ও কয়েকটি পুরাণ বিবর্ণ বাক্স। এ ছাড়া দু'খানা নূতন চেয়ার ও একটি টেবিলও ঘরে আছে। চুণ ও রঙের বিরহে বিমর্ষ দেয়াল ও জানালা-কপাট, সেকেলে খাটটিতে ছেঁড়া তোষকের বিছানা, কোণে টাঙ্গানো দড়িতে ময়লা কাপড়-জামা ঝুলানো, সময়ের অনাচারে আত্মহারা বাক্স-প্যাটরা, এ সমস্তের মাঝখানে জয়গোপালের বিবাহের নূতন চকচকে আসবাব কয়েকটিকে যেমন খাপছাড়া দেখায়, এ বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে শোভারাণীও পাইয়াছে তেমনি একটি বৈশিষ্ট্য। এক গামলা ঠাণ্ডা জলের উপর সে ঝুঁকিয়া আছে, অঞ্জলি ভরিয়া তার নাকে জল দিতেছে বীণা। স্বামীকে দেখিয়া বীণা তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল, শোভারাণী সকাতর গুমরাণির সঙ্গে বলিল, 'ওগো, আমার নাকটা একেবারে গেছে, কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ ?'

মহেন্দ্রজিৎ উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'আর কোথাও লাগে নি ত' তোমার ?'

'লাগে নি ? সমস্ত শরীর চুরমার হয়ে গেছে।'

মৃদুস্বরে মহেন্দ্রজিৎ বলিল, 'হাড় বোধ হয় ভাঙেনি কোথাও, কেটে ছিঁড়ে গেছে। নাকেই বেশী লেগেছে।'

শোভারাণী রাগিয়া তীক্ষ্ণ খোনা গলায় বলিল, 'তুমি তো সব জান, মস্ত ডাক্তার তুমি! ওগো মাগো, কি কুক্ষণেই আজ বাড়ী

থেকে বেরিয়েছিলাম। তোমারও যে সারা গায়ে রক্ত লেগেছে, কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে। কিছু হয় নি তো তোমার ?'

মহেন্দ্রজিৎ বলিল, 'এই পায়ে আর এই হাতে খুব চোট লেগেছে, আর অনেকটা যায়গা কেটে গেছে। নাকটা বুঝি খুব টন্ টন্ করছে তোমার ?'

নাকের কনকনানিতে শোভারাণীর দু' চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া গামলার লাল জলে জল ঝরিয়া পড়িতেছিল, সম্ভবত, এই জলের পর্দ্দায় তার দৃষ্টি ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই এর আগে স্বামীর অবস্থাটা নজরে পড়ে নাই। বীণা এক অঞ্জলি জল তার নাকে প্রয়োগ করায় সে মুখেও স্বামীর কথার জবাব দিতে পারিল না, মাথাটাও নাড়িতে পারিল না।

জয়গোপালের মা বলিলেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা তুমি ? বস এই চেয়ারটাতে, নয় শুয়ে পড়বে তো তা-ই পড়। কি বাঁচানটাই ভগবান্ আজ বাঁচিয়েছেন! এখনও আমার বুকটা ধড়ফড় করছে। সওয়া পাঁচ আনার বাতাসা এনে ওবেলা হরির লুট দেব, মানত করেছি। এ্যাদ্দিন পরে এমন ভাবে তুমি আবার এ বাড়ীতে আসবে, তা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি বাবা। কত বড় হয়ে গেছ তুমি! প্রথমে চিনতেই পারিনি তোমাকে, চিনতে পেরেই,—না বাবা তুমি শোও, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে তোমার।'

বলিতে বলিতে মলিন আঁচলে সস্নেহে সন্তর্পণে মহেন্দ্রজিতের কপালের রক্ত মুছিয়া লইলেন। ছেলের সঙ্গে স্কুলে পড়িবার সময় নিজের বাড়ীতে নিষিদ্ধ অনাচারগুলি করার ও আচার প্রভৃতি কতকগুলি অখাদ্য খাওয়ার সুবিধার জন্য যে মাঝে মাঝে এ বাড়ীতে

আসিত, তাকে মাসী বলিযা ডাকিত এবং স্নেহ করিবার অধিকার দিত, তার কপালের রক্ত বলিযাই বোধ হয় মার মনের স্বাভাবিক রক্তের আতঙ্কটা মাথা তুলিতে পারিল না।

অম্বিকা ডাক্তার আসিতে আসিতে বাজিয়া গেল এগারটা। মোটর দুর্ঘটনায় এত কম আঘাত লাগিয়াছে দেখিযা অম্বিকা ডাক্তার যেন ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলেন। মাথা নাড়িয়া বলিলেন যে, না ডাকিলেই হইত তাকে, যেখানে যেখানে কাটিয়া গিয়াছে, একটু টিনচাব আইডিন, আর শোভারাণীর নাকে যেমন জল দেওয়া হইতেছে, ব্যথা না কমা পর্য্যন্ত তেমনি দিয়া গেলেই ব্যাপার চুকিয়া যাইত। তবু, কয়েকটা ব্যাণ্ডেজ তিনি বাঁধিলেন এবং যাওয়ার সময় জযগোপালকে আড়ালে ডাকিয়া দাবী করিয়া বসিলেন ফি। এ বাড়ীতে আগে তিনবাব আসার দরুণ তাঁর তিন দুগুণে ছ'টাকা ফি বাকী আছে, আজ তিনি কোনমতেই ধারে কারবার করিবেন না।

অম্বিকা ডাক্তার একটা হাতল-ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, 'না চলবে না। এই বসলাম আমি, টাকা পেলে উঠব। আগের টাকা দেবে না জানি, আজকের ফি'টা আমার চাই।'

জয়গোপাল তখন টাকার সন্ধানে গেল। ছাদে উঠিবার সিঁড়ির নীচে আবছা অন্ধকার ঘুপচির মধ্যে ছোট একটি জল-চৌকীর উপরে দেওয়ালে ঠেস দিয়া শ্রীকৃষ্ণের একটি বাঁধানো ছবি আছে, ছবিটির সামনে বসিয়া তার বাবা নন্দগোপাল ধ্যান করিতে-ছিলেন। সংসারে তাঁর মন নাই, চাকরী ছাড়ার পর আজ পাঁচ বছর একবেলা হবিষ্য করেন, কৃষ্ণচিন্তায় দিন কাটান, মাঝে মাঝে

শ্রীকৃষ্ণের জন্য কাঁদেনও। বছর সাতেক আগে, তার যখন সাতাশী টাকার চাকরীটা বজায় ছিল এবং জীবনবীমার হাজার দুই টাকা পাইয়া নিজেকে মস্ত বড়লোক ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, দেড়-টাকা সুদে একজন প্রতিবেশীকে তখন শ'চারেক টাকা কর্জ্জ দিয়া-ছিলেন। এতকাল প্রতিবেশীটি এক পয়সা সুদও দেয় নাই, আসলও দেয় নাই, কিন্তু পাড়ায় নন্দগোপালের ধ্যান-ধারণার খ্যাতি রটিবার পর হঠাৎ একটি মেয়ে মারা যাওযায প্রতিবেশীটির মনে আসিয়াছিল অস্বস্তি, কয়েকমাস আগে একটা বড় মোকদ্দমায় হারিয়া সে অস্বস্তি দাঁড়াইয়া গিয়াছে ভয়ে। মাঝে মাঝে অযাচিত-ভাবে সে দু'পাঁচ টাকা নন্দগোপালকে দিয়া যায়, খোলামকুচির মত নন্দগোপাল টাকা কটিকে ঠেলিযা দেয় জলচৌকীর নীচে। বাড়ীর কেউ প্রার্থনা জানাইলে জলচৌকীর তলাটা হাতড়াইয়া টাকা থাকিলে বাহির করিয়া দেন, না থাকিলে একগাল হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলেন, 'টাকা ত নেই!'

কাল বাজার করার পযসা না থাকায় একবার জলচৌকীর বাক্সটি হাতড়ান হইয়াছিল। তবু জয়গোপাল প্রথমে বাবার কাছেই টাকার খোঁজে গেল। আগে একবার চুপি চুপি জলচৌকীটি উঁচু করিয়া কোণের দিকে সে দুটি টাকা পাইয়াছিল, নন্দগোপাল হাতড়াইয়া যার সন্ধান পান নাই।

বলা মাত্র জয়গোপাল চৌকীর তলে হাত ঢুকাইয়া দিলেন, তার পর হাত বাহির করিয়া আনিযা যেমন ছিলেন তেমনি হইয়া গেলেন। আজ তিনি হাসিলেন না, মাথা নাড়িলেন না, কথাও বলিলেন না।

'আমি একবার খুঁজে দেখি বাবা।'

'কি যে বলিস্। মাছ খাস, মাংস খাস, নোংরা হয়ে থাকিস, ঠাকুরকে ছুঁবি তুই? ছুঁয়েছিস্ না কি কখনো?'

পনর দিনের মধ্যে মাছ-মাংস চোখেও দেখে নাই বলিয়া প্রতিবাদ জানানোর বদলে জয়গোপাল তাড়াতাড়ি বলিল, 'না না, তাই কখনো পারি? আমার বুদ্ধি নেই? চৌকীটা একটু উঁচু করে তুমিই একবার দেখ না বাবা, আড়ালে-টাড়ালে যদি দু' একটা টাকা থাকে?'

নন্দগোপাল আহত-বিস্ময়ে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুরের আসন উঁচু করে টাকা খুঁজব? তুই ক্ষেপে গেছিস্, বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে তোর।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। চোখ বুজিয়া বসিলেন, 'কলেজে পড়ার সময় তোর কত তেজ ছিল, সাহস ছিল, তুই এ রকম হয়ে যাবি ভাবি নি বাপু। ন্যায়সঙ্গত কাজ করতে আগে তো তোর লজ্জা হত না? যাদের জন্য অম্বিকা এসেছে, তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওর ফি দিয়ে দিবি, এতে তোর সঙ্কোচ হচ্ছে কিসের? ভিক্ষা তো চাইছিস্ না?'

এভাবে এত কথা নন্দগোপাল কদাচিৎ বলেন। কিন্তু, সেজন্য নয়, জয়গোপাল অবাক্ হইয়া গেল এই ভাবিয়া যে, এখানে ধ্যানে বসিয়া নন্দগোপাল কি করিয়া জানিলেন, অম্বিকা ডাক্তারের জন্য হঠাৎ টাকার দরকার হইয়াছে। সেইখানে বসিয়া একটু ভাবে জয়গোপাল। মনে আজকের মোটর দুর্ঘটনার মত একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যায়। সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটি তবে এখানে বসিয়া টের

পান নন্দগোপাল? তাঁর কৃষ্ণচিন্তার ব্যাকুলতা মাঝে মাঝে দু' চোখে জল ফেলা, এ সমস্তের কারণ স্ত্রীপুত্রের দুঃখদুর্দ্দশা হওয়াও অসম্ভব নয়! পরলোকের জন্য নয়, ইহলোকের আপন জনেরা সব দিন দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া সব সময় অশান্তি জাগিয়া থাকে, তাই সব সময় এমনিভাবে শান্তি খোঁজেন।

তা-ই স্বাভাবিক। অশান্তি অসহ্য হইয়া উঠিলে যে যে ভাবে পারে শান্তি খোঁজে। কযেক ঘণ্টা আগে সেও হয তো শান্তির খোঁজেই মহেন্দ্রজিতের মোটরের সামনে গিযা দাঁড়াইযাছিল? তা ছাড়া ও পাগলামির আর কি মানে হয?

মহেন্দ্রজিতের হাঁটুতে চোট লাগিযাছিল জোরেই। ধীরে ধীরে হাঁটু ফুলিয়া উঠিতেছিল, ব্যথাও বাড়িতেছিল। এখন আর রক্ত লাগিয়া বিছানা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল না, তাই জযগোপালের বিছানাটি পাতিয়া তাকে শুইতে দেওয়া হইয়াছে। মযলা চাদরটি বদলাইয়া একটি ছেঁড়া কিন্তু পরিষ্কার ধুতি ভাঁজ করিয়া পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে বিছানায়। একটি সিগারেট ধরাইয়া মহেন্দ্রজিৎ দুভাঁজ ধুতির নীচে ওয়াড়বিহীন তেল-চটচটে বালিশে মাথা দেওয়ার অস্বস্তি আর হাঁটুর যন্ত্রণা দমন করার চেষ্টা করিতেছিল, জয়গোপাল আসিযাই বিনা ভূমিকায় দাবী করিয়া বসিল, 'ডাক্তারের ফি'টা দিতে হবে ভাই।'

মহেন্দ্রজিৎ চমকাইয়া বলিল, 'আমার মানিব্যাগ? দেখ তো জামাটার পকেটে আছে না কি?'

দেয়ালে মশারি-টাঙ্গানোর পেরেকে তার রক্তমাখা পাঞ্জাবীটি ঝুলিতেছিল। পকেটগুলি খুঁজিয়া দেখিয়া জয়গোপাল বলিল, 'নেই'।

মহেন্দ্রজিৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'নেই? বুক-পকেটে ছিল, কোথায় গেল তবে ব্যাগটা? অনেকগুলি টাকা ছিল ভাই ব্যাগে, তিরিশের কম নয়। গাড়ীতে পড়ে গেছে না কি, গাড়ীটা যখন উল্টে গেল তখন?'

জয়গোপালের দৃষ্টির অস্বাভাবিকতা বছরখানেক হয় চোখে পড়ার মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—মনোবেদনায় জ্বল জ্বল, আর বুকের জ্বালায় ছল ছল এই দুরকম দৃষ্টি। তার এখনকার দৃষ্টি দেখিয়া মহেন্দ্রজিৎ ভড়কাইয়া গেল।

'নয় তো কোথায় যাবে তোমার ব্যাগ, তোমার তিরিশ টাকার ব্যাগ? আমি তোমাকে গাড়ী থেকে টেনে বার করেছি, বাড়ীর মধ্যে এনেছি। বাড়ীতে কোথাও পড়ে গিয়েছে। ভেবো না, বাড়ীর কেউ কুড়িয়ে নিয়েছে। সুযোগ পেলেই আমরা পরের ঘাড় ভাঙি না, তা জেনে রেখ।'

'তাই বললাম আমি?'

'কি জানি, বললে কি না। তোমাদের বলা আর করার মানে বুঝা দায়।'

'আর, তোমাদের বলা আর করার খুব মানে বুঝা যায় না? গাড়ী উল্টে দিয়ে তুমি আমাদের খুন করার ফিকিরে ছিলে।'

জয়গোপাল প্রথমটা অবাক্ হইয়া গেল, তার পর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল। ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কোণঠাসা হলে মানুষ এমনি আবোলতাবোল বলে। ছেলেবেলায়ও তুই এ

রকম ছিলি মহেন্। দোষ করে ধরা পড়লে এমন সব অদ্ভুত কৈফিয়ৎ দিতিস যে, হাসতে হাসতে লোকের দম আটকে যেত। এই জন্যই তো অত ভালবাসতাম তোকে। যে মোটর-চাপা পড়ে সে বেঁচে থাকে, আর, যারা চাপা দেয় তারা খুন হয়, না?'

জয়গোপাল হাসিল, হঠাৎ তুই বলা, আর ভালবাসার কথা ঘোষণা করা, এই তিনটি নূতন অস্ত্রে, মহেন্দ্রজিৎ একেবারে কাবু হইয়া গেল। সময়ের কবরে বন্ধুত্বকে পুঁতিয়া ফেলা যায়, কিন্তু সুযোগ পাইয়া সে বন্ধুত্ব ভৌতিক উপদ্রব সুরু কবিলেই মুস্কিল। আর, কিছু বলার ছিল না, তবু মহেন্দ্রজিৎ জোর করিয়া বলিল, 'তোকে বাঁচাতে গিয়েই তো গাড়ীটা উল্টে গেল। আমবা তো মরেও যেতে পারতাম।'

জয়গোপাল গম্ভীরমুখে বলিল, 'কেন বাঁচাতে গেলি? একবার উপোস করিয়ে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করবি, একবাব বাঁচাবার জন্য নিজের প্রাণ দিতে যাবি, তুই কি খেলা পেয়েছিস্ না কি আমার সঙ্গে? এ রকম ছেলেমানুষি করতে নেই, বযস তো হয়েছে। দেখে আসি খুঁজে, ব্যাগটা কোথায় পড়ল।'

গাড়ীতেই ব্যাগটা পাওয়া গেল। অম্বিকা ডাক্তার ধৈর্য্য ধরিয়া বসিযা ছিলেন, একদিনেব বদলে একেবারে চারিদিনের ফি পাওয়ার আনন্দে তিনি জয়গোপালকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'বেঁচে থাক বাবা।' মহেন্দ্রজিৎকে ব্যাগটা ফেরত দিয়া জয়গোপাল বলিল, 'আট টাকা নিয়েছি।'

তেল-চটচটে বালিশের নীচে ব্যাগটা গুঁজিয়া দিয়া মহেন্দ্রজিৎ বলিল, 'আমার কিন্তু দোষ ছিল না, ভাই। চাকরী করার একটুও

ইচ্ছা আমার ছিল না, বাবা জোর করে নেওয়ালেন। এত যে রাগ করছিস্ তুই, তোর যে চাকরীটা হ'তই, তার কি মানে আছে?'

জয়গোপাল বলিল, 'হ'ত কি, হয়ে গিয়েছিল। তবে, রাগটাগ আমি করি নি, ভাই। আর কেউ হলে, অবশ্য রাগ হ'ত, কিন্তু তুই হলি আমার ছেলেবেলার বন্ধু, এই সামান্য কারণে তোর ওপরে রাগ করব?' জয়গোপাল চৌকীর প্রান্তে বসিল। মহেন্দ্রজিতের হাঁটুটা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, 'তোর মনে আছে মহেন্, একদিন দুপুরবেলায় স্কুল পালিয়ে দুজনে কাঁচা আম খেতে এসেছিলাম, গাছ থেকে পড়ে তোর হাঁটু ভেঙে গিয়েছিল?'

মহেন্দ্রজিৎ ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল, 'কবে?'

'মনে নেই? তোর কিছু মনে থাকে না, মহেন্। হয় তো এই হাঁটুটাই ভেঙেছিল।'

হাঁটু ভাঙিয়া থাকিলে সে কথা মনে না থাকিবার কারণ মহেন্দ্রজিৎ ভাবিয়া পায় না। অস্বীকার করাও অসম্ভব। হাঁটু ভাঙিয়াছিল কি ভাঙে নাই, তাই লইয়া তর্ক করার জন্য জয়গোপাল পুরাণো দিনের কথা তোলে নাই। স্কুল পলাইয়া যারা কাঁচা আম খাইতে আমগাছে উঠিত, তাদের মধ্যে কি নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল, জয়গোপাল শুধু সেই কথাটা মনে করাইয়া দিতে চায়। গাছ হইতে পড়ার কথাটা কল্পনা হইতে পারে, দুজনের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য বন্ধন ছিল, সেটা সত্য।

খাওয়ার ব্যাপারটা সংক্ষেপেই চুকিয়া গেল। ডাল, ভাত আর তরকারী। দুটি শিশুর জন্য যেটুকু দুধ ছিল বাড়ীতে, তাও

দুজনকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ওবেলা দুধ আসে তো আসিবে, না আসিলেও ক্ষতি নাই। এ বাড়ীর কচি ছেলে-মেয়েরা দু' একদিন বার্লি বা শটী খাইয়া থাকিতে জানে।

শুইয়া শুইয়াই মহেন্দ্রজিৎ ভাত খাইতেছিল, উঠিবার ক্ষমতা ছিল না। একটা সিগারেট ধরাইয়া সে ভাবিতেছিল বাড়ী ফেরার কথা। গাড়ীটা চলিলেও গাড়ী চালান তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু, যে ভাবেই হোক যাওয়া চাই। এ বাড়ীতে একটা দিনও সে অতিথি হইয়া থাকিতে পারে না। প্রতিমুহূর্তে তার মন যেন বেশী মুষড়াইয়া যাইতেছে, মনের অস্বস্তি বাড়িতেছে।

জয়গোপাল খাইয়া আসিল। যাওয়ার কথা শুনিয়া সে আশ্চর্য্য ও আহত হইল। অনুযোগ দিয়া বলিল, 'একটা দিন গরীব বন্ধুর বাড়ী থাকতে তোর কষ্ট হবে? একটু সুস্থ না হয়ে এ অবস্থায় চলে যাবি?'

মহেন্দ্রজিৎ বলিল, 'সে জন্য নয়, হাঁটুটার একটা ভাল ব্যবস্থা না করলে—'

'ডাক্তার সেঁক দিতে বলে গেলেন, মেয়েদের খাওয়া হলেই সেঁক দেবার ব্যবস্থা করে দেব।'

এ কথার জবাব নাই। জয়গোপালের ক্ষুব্ধ অনুযোগে মহেন্দ্রজিতের মন যেন আরও মুষড়াইয়া গেল। কোন এক অজানা জগতের মানুষ যেন জয়গোপাল, আগাগোড়া সে যেন অদ্ভুত দুর্ব্বোধ্য নিয়ম মানিয়া চলিতেছে। অল্প বয়সের প্রীতির সম্পর্ক কি ইস্পাতে তৈরী হয় যে, বছরের পর বছর চলিয়া গেলেও অবিকৃত থাকিয়া যাইবে? চাকরী কাড়িয়া লওয়ার অভিমানে

বন্ধুর মোটরের নীচে জীবন বিসর্জ্জন দিতে গিয়াছিল ভাবিলেই গা ছম ছম করে। ডাক্তারের ফি দেওয়ার জন্য নিঃসঙ্কোচে টাকা দাবী করা, কলহ করিতে করিতে 'তুমি'র বদলে 'তুই'-কে স্বাভাবিক করিয়া তোলা, অতীত দিনের কথা বলিতে বলিতে সমস্ত মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া ওঠা; আরও কত কি,—স্থূল এবং সূক্ষ্ম, স্পষ্ট ও ইঙ্গিত। গরীব বন্ধু! গরীব বন্ধুদের চুলোয় পাঠাইয়া তার তো কোন দিন ভাবনা হয় নাই, মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে থাকে নাই! আজ একদিনে জয়গোপাল একাই কি তার জীবনের এই চিরন্তন রীতি উল্টাইয়া দিবে?

* * * *

ঘরের ঠিক বাহিরে বারান্দায় মেয়েরা খাইতে বসিল। বীণা, কনক আর শোভারাণী। পেটের জ্বালাতেই হোক, আর অম্বিকা ডাক্তার নাকে দেওয়ার জলের সঙ্গে মিশানোর জন্য যে ওষুধটা দিয়া গিয়াছিলেন, তার গুণেই হোক, শোভারাণীর নাকের যন্ত্রণা বোধ হয় কমিয়াছে। কারণ, খাইতে বসিয়া মৃদু একটু খোনা সুরে তাকে বেশ কথাবার্ত্তা বলিতে শোনা গেল। গয়নার কথা উঠিল খুবই সহজে, তার নিজেরই একটা প্রশ্নের সূত্রে।

'তোমাদের হাতে শুধু একটি করে চুড়ি কেন, ভাই?'

বীণা ও কনক ভাতের গ্রাস গিলিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। একটা অতিরিক্ত ঢোঁক গিলিয়া কথাটার জবাব দিল বীণা।

'বেশী গয়না পরতে আমাদের ভাল লাগে না। সব বাক্সে তোলা আছে।'

শোভারাণী সায় দিয়া বলিল, 'আমারও তাই। দেখ না, বাইরে বেরিয়েছি তবুও এই সরু ফিনফিনে হারটি বদলে বিছে-হারটি পরে আসি নি। এমন ভারি আমার সেই হারটা! সোণা আছে সতর না আঠার ভরি। নেকলেসটা গলায় দিতে যদি বা সাধ হয়, সেই হারটা পরতে একটুও ইচ্ছে করে না। কটা বাজবে এখন? সাড়ে বারটা হবে, না? এমন ভুলো মন ভাই আমার, ঘড়িটা হাতে লাগিয়ে আসতে পর্য্যন্ত ভুলে গেছি!'

'সোণার ঘড়ি বুঝি?' কনক জিজ্ঞাসা করিল।

'হ্যাঁ,—কাঁটা আর দাগগুলোতে কি যেন বলে, তাও মাখানো আছে, অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে। তোমার স্বামী কি করেন?'

স্বামী কিছু করে না বলিয়া হয় তো নয়, নূতন বৌ বলিয়াই স্বামীর কথায় কনক বোধ হয় লজ্জা পাইল। বীণা বলিল, 'দাদা কিছু করে না, চাকরী-বাকরী খুঁজছে। ক'দিন আগে একটা ভাল চাকরী হয়েছিল, ছেলেবেলার এক বন্ধু বজ্জাতি করে নিজে চাকরীটা ভাঁওতা দিয়ে নিয়ে নিলে। তোমার নেকলেসে ক' ভরি সোণা আছে তা তো বললে না?'

*　　　*　　　*　　　*

ঘরের মধ্যে জয়গোপাল বলিল, 'একটা সিগারেট দে তো মহেন্, দেখি কেমন লাগে টানতে।'

'সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।'

'তোর তো তা হলে ভারি অসুবিধা হবে। পয়সা দে আনিয়ে দিচ্ছি।'

মহেন্দ্রজিতের বিহ্বল দৃষ্টি কড়িকাঠের দৈর্ঘ্য মাপিতেছিল, এ কথার সে জবাব দিল না। তারপর বারান্দায় মেয়েরা না শুনিতে পায় এরকম নীচু গলায় বলিল, 'তুই চাকরী করবি জয়ু?'

'করব না! চাকরী না করলে খাব কি?'

'আমার কাছে যাস, বাবার আফিসে ঢুকিয়ে দেব। প্রথমটা মাইনে খুব কম বলে যদি আপত্তি করিস, তা হলে কিন্তু চলবে না। বিপিন বাবু বলে একজন বুড়ো ভদ্রলোককে বছর শেষ হলে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে, সে পোষ্টটা আমি তোকে দেওয়াব। বাবা অবশ্য গোলমাল করবেন, কলা দেখাবার চেষ্টা করবেন প্রথমটা, কিন্তু আমি জোর জবরদস্তি করলে—'

কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিয়া জয়গোপাল সজোরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তার ঘুম আসিতেছিল। বাঁচিয়া থাকাটাই এ জগতে সব চেয়ে পরিশ্রমের কাজ, কাজ না থাকিলে যৌবনেই এমন গভীর শ্রান্তি আসে! পেটে ভাত পড়িলেই চোখে ঘুম আসিয়া প্রমাণ করিয়া দেয়, অকালবার্দ্ধক্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তবে, আজকের মত দুর্ঘটনা, ঘটনা ও উত্তেজনায় ঠাসা দিনটিতে চোখে তার ঘুম আসা উচিত হয় নাই। মাথায় একটা ঝুঁকি দিয়া জয়গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, 'কবে যাব তোর কাছে?'

'আট দশ দিন পরে যাস্, বাবাকে বলে কয়ে রাখব, আমার হাঁটুর ব্যথাটাও কমবে।'

জয়গোপাল হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল! বীণার শিশু যখন জন্মায়, বাড়ীতে কিছু কাঠকয়লা আসিয়াছিল। দু' একদিন এ বাড়ীর ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া শিশুটি পলাইয়া গিয়াছে,

কাঠকয়লাগুলি আছে। একটা ভাঙা কড়াইয়ে, সেই কয়লার আগুন করিয়া জয়গোপাল নিজেই মহেন্দ্রজিতের হাঁটুতে সেঁক দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। এমন কি, এখনো ব্যবহারযোগ্য পুরাণ একটি আলোয়ান ভাঁজ করিয়া সেঁক দেওয়ার কাজে লাগাইতেও তার কিছুমাত্র দ্বিধা জাগিল না। সেঁক দিতে দিতে নীচু গলায় বলিল, 'আমার আর একটা উপকার করতে হবে ভাই তোকে। ঐ যে আমার বোনকে দেখলি, তোর স্ত্রীর নাকে যে জল লাগাচ্ছিল, ওর স্বামীর জন্যও একটা কাজ জুটিয়ে দিতে হবে। পঁচিশ, ত্রিশ টাকার যেমন তেমন একটা কাজ। তুই একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে।'

সেঁক দিতে আরম্ভ করা মাত্র মহেন্দ্রজিৎ আরাম বোধ করিতেছিল, মনের অস্বস্তিও তার অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। সে চোখ বুজিয়া বলিল, 'আচ্ছা, দেখব। কিন্তু, ওর নাকে যে জল দিচ্ছিল সে কি তোর বোন?'

জয়গোপাল একটু ভাবিয়া বলিল, 'তুই যখন দেখতে গিয়েছিলি তখন যে দিচ্ছিল, সে নয়। পরে যে দিচ্ছিল সে।'

কথাটা বানানো নয়। জয়গোপালের নির্দ্দেশে সত্য সত্যই কনকের বদলে বীণা শোভারাণীর সেবা আরম্ভ করিয়াছিল। সে নিজে যখন মহেন্দ্রজিৎকে লইয়া পড়িয়াছে, স্ত্রীকে তার স্ত্রীর সেবা করিতে দেওয়াটা জয়গোপালের মনে হইয়াছিল বাহুল্য, সেবার অপচয়। তার চেয়ে অনুপস্থিত স্বামীর প্রতিনিধি হিসাবে বীণা কিছু দাবী সৃষ্টি করিয়া রাখিলে হয় তো কাজে লাগিতে পারে।

এটুকু বুঝিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। যে মন এভাবে

চিন্তা করে, সে মনের যে কি অবস্থা হইয়াছে, ভাবিতে গিয়া মহেন্দ্রজিতের মানসিক অস্বস্তি আবার পূর্ব্বের মত প্রবল হইয়া উঠিল। এ বাড়ীর যে খাদ্য পেটে গিয়াছিল, আবার যেন সে তার তিক্ত স্বাদটা অনুভব করিতে লাগিল। কড়াইযে কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধে বাতাস এত ভারি হইয়া উঠিয়াছে যে, টানিয়া টানিয়া শ্বাস গ্রহণ না করিলে দম যেন আটকাইয়া যাইবে। জয়গোপালের মনের অবস্থা যে রকমই হইয়া থাক, অন্য কোন রকম হওয়া যে সম্ভব ছিল না, নিজের অসমাপ্ত বিকৃত অনুভূতিগুলি যেন তার অকাট্য প্রমাণের মত মহেন্দ্রজিৎকে অতিরিক্ত নির্ম্মমতার সঙ্গে পীড়ন করিতে থাকে। কয়েকঘণ্টার মধ্যে এবাড়ীর আবহাওয়া তাকে যদি এমন করিয়া দিতে পারে, দিনের পর দিন এখানে বাস করিতে করিতে জয়গোপালের আরও বেশী খাপছাড়া হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু, মিনিটে মিনিটে তার জয়গোপাল নব নব যন্ত্রণা আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে কেন? সে তো স্বীকার করিয়াছে, ওদের চাকরী করিয়া দিবে।

মহেন্দ্রজিৎ চোখ মেলিল। কোণঠাসা অসহায় শত্রুর চরম অস্ত্র প্রয়োগ করার মত অস্বাভাবিক জোর দিয়া বলিল, 'বুঝলি জয়ু, যেমন করে পারি তোর আর তোর বোনের স্বামীর চাকরী আমি করে দেবই। যদি না দিই—'

বারান্দায় শোভারাণী বীণাকে বলিতেছিল, '…আজ সারাদিন বেড়িয়ে কাল সকালে আমরা মোটরেই বর্দ্ধমান চলে যেতাম। কে জানত এমন কাণ্ড হবে! তবু প্রাণে প্রাণে যে বেঁচে গেছি তাও আমাদের ভাগ্যি!'

মাথার রহস্য

শেষ বয়সে একসঙ্গে থোক দুই হাজার টাকা হারানোর পর পতিতপাবনের মাথাটা একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

বেচারী গরীব মানুষ। সারাজীবন সামান্য মাহিনার চাকরী করিয়া অতিকষ্টে ছেলেদের মানুষ করিয়াছে, ধার-কর্জ করিয়া স্ত্রীর গহনা বেচিয়া মেয়ে দুটির বিবাহ দিয়াছে, জীবনে একটিবারের জন্যও কোনদিন দুই হাজার টাকা নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। পেন্সন নেওয়ার পর মাসে মাসে সাঁইত্রিশ টাকা পেন্সন আর জীবনবীমার ঐ দুই হাজার টাকা ছাড়া পতিতপাবনের আর কিছুই ছিল না। টাকা তো নয়, গায়ের রক্তের চেয়েও বেশী। কলিকাতা সহরের ভোজবাজীতে এক মিনিটের মধ্যে সেই টাকাটা যে কোথায় উড়িয়া গেল!

ব্যাপারটা যে কি হইয়াছিল বাড়ীর লোকে ঠিক জানে না। নন্দীগ্রামে পতিতপাবনের বাড়ী। পাওনা টাকাটা আদায় করিয়া ব্যাঙ্কে জমা দিয়া আসিবার জন্য সে কলিকাতায় গিয়াছিল। তিন দিন পরে সে গম্ভীরমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। জীবনযুদ্ধে হাসি-খুসী ভাবটা পতিতপাবনের অনেক দিন উবিয়া গিয়াছে, তবু সাধারণত সে এরকম খাপছাড়া গাম্ভীর্য্যের ধার ধারে না। চোখের চাউনিও যেন একটু কেমন-কেমন।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, টাকা পেলে?

পেয়েছি।

কোন্ ব্যাঙ্কে জমা দিলে? সরকারী ব্যাঙ্কে ত?

পতিতপাবন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ব্যাঙ্কে জমা দেব কেন? আমি কি সে রকম হাবা না কি? পুঁতে রেখেছি।

পুঁতে রেখেছ! কোথায় পুঁতে রেখেছ?

তা দিয়ে তোমার কি দরকার? যেখানে হোক রেখেছি।

তারপর ধীরে ধীরে মোটামুটি ব্যাপারটা বোঝা গেল। টাকাটা পতিতপাবন যথারীতি আদায় করিয়াছিলেন, তারপর কি যেন হইয়াছে। টাকাটা হয় কোথাও পড়িয়া গিয়াছে, নয় কেউ পকেট মারিয়াছে, নয় ভাঁওতা দিয়া বাগাইয়া লইয়াছে, নয় অন্যভাবে গিয়াছে চুরি।

বাড়ী ফিরিবার পর দিন পতিতপাবনের মাথাটা কিছুক্ষণের জন্য একটু সাফ হইয়া আসিয়াছিল, সেই সময়ে তার কথাবার্ত্তা হইতে এই পর্য্যন্ত অনুমান করা গিয়াছে।

বড় ছেলে মাধব যা করার ছিল করিয়া দেখিল। বাপকে জেরা করিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যে টিনের স্যুটকেশ সঙ্গে লইয়া পতিতপাবন কলিকাতায় গিয়াছিল তন্ন তন্ন করিয়া সেটি খোঁজাখুঁজি করিল, কলিকাতা গিয়া এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিল, তারপর বাড়ী ফিরিয়া বিষণ্ন মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, ও টাকা গেছে মা।

অন্নপূর্ণা কাঁদিতে লাগিল। কি অদেষ্ট করেই জন্মে ছিলাম আমি। টাকাকে টাকা গেল, এদিকে আবার কি সর্ব্বনাশ হল ছাখ! হ্যাঁ রে মাধু, টাকার শোকে মানুষ কি সত্যি পাগল হয়ে যায়? আস্তে আস্তে কমে যাবে তো?

মাধব মুখ খিঁচাইয়া বলিল, যাবে না? ওতো বাবার ঢং। টাকাগুলো বিসর্জ্জন দিয়ে এসে কি আর করেন, মাথাখারাপ হওয়ার ভাণ করছেন।

অন্নপূর্ণা আরও বেশী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তোরও মাথা

খারাপ হয়েছে মাধু, নইলে ওঁর নামে তুই এমন কথা বলিস্? ঢং করবার মানুষ উনি?

মাধব মুখ ভার করিয়া বলিল, আমি এবার কাগজ বার করব কি দিয়ে? কত বললাম, বাবা আমি সঙ্গে যাই, অতগুলি টাকা একা তুমি সামলাতে পারবে না, তখন সে কথা কানে তোলা হল না। এবার? এবার কি করব আমি? কাগজের জন্য কার কাছে গিয়ে হাত পাতব?

এদিকে এমন সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, আর কাগজের ভাবনাটাই তোর কাছে বড় হল মাধু?

হবে না? জান, এসময় আমার মনের মত একটা মাসিক বার করতে পারলে এক বছরে বড়লোক হয়ে যেতাম? এবার অন্য লোকে মেরে নেবে।

দু'হাজারের মধ্যে পাঁচশ টাকা মাধবকে দেওয়ার কথা ছিল, সেই শোকেই তাকে বিশেষ রকম কাবু হইয়া পড়িতে দেখা গেল। আর, স্বামীর রকম-সকম দেখিয়া অন্নপূর্ণার যত বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল, অবিবাহিতা কন্যা পুঁচকির দিকে চাহিয়া তত উথলিয়া উঠিতে লাগিল টাকার শোক।

পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করে, কাঁদছ কেন?

অন্নপূর্ণা বলে, ওগো আমাদের পুঁচকির বিয়ে দেব কি করে?

পতিতপাবন আশ্চর্য্য হইয়া বলে, পুঁচকির বিয়ে? সেদিন না পুঁচকির বিয়ে দিলাম? আবার বিয়ে কিসের?

মাধবের বৌ শাশুড়ীর দেখাদেখি এতক্ষণ যে চোখ মুছিতেছিল, এবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া মুখে আঁচল চাপা দেয়। বেকারের বৌ, কিন্তু সংসারের ভাবনা-চিন্তা না থাকায় আর নিজস্ব

ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু না থাকায় সংসারে হাসিকান্নার স্রোতেই গা এলাইয়া ভাসিয়া বেড়ায়। তবে একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পরের দেখাদেখি সে কাঁদে বটে, হাসির কথায় হাসে কিন্তু নিজে নিজেই।

পতিতপাবন হাঁকিতে আরম্ভ করে, পুঁচকি! পুঁচকি!

পিছন হইতে সামনে আসিয়া পুঁচকি বলে, কি বাবা?

তুই কেমন মেয়ে রে পুঁচকি? দু'বছর আগে অত খরচপত্র করে তোর বিয়ে দিলাম, আবার তোর বিয়ে কিসের? ইয়ার্কি পেয়েছিস্ না কি?

ঠাহর করিয়া দেখিয়া পতিতপাবন রাগিয়া আগুন হইয়া যায়।

সিন্দুর দিস্‌নে যে তুই? কেন দিস্‌নি হারামজাদি? আর একবার আমার দফা নিকেশ করবার মতলব করেছ, না? একবারে সাধ মেটেনি।

মেজছেলে যাদব অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, সে চোখের ইসারা করিতে হতভম্ব পুঁচকি পলাইয়া যায়। পতিতপাবন নিজের মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে যে, সে আর পারিয়া উঠিল না, এত কষ্টে যদি বা হাজার দুই টাকা যোগাড় করিয়াছে, সকলের নজর ঐ টাকাটার উপরে ওটা যতক্ষণ না শেষ করিতে পারিতেছে, কারও আর স্বস্তি নাই।

যাদব বলে, তোমার টাকা কোথায় পোঁতা আছে আমরা কেউ তো তা জানিও না, বাবা!

জানবার জন্যে মতলব তো বাগাচ্ছ হাজার রকমের।

তাই বা কেন বাগাব? টাকা দিয়ে আমাদের কি দরকার? তোমার টাকা যেখানে আছে সেইখানে থাক।

মাথার ভিতরে যার গোল বাধিয়া গিয়াছে, কে তাকে

বুঝাইবে? এ বাড়ীতে সকলের চেয়ে মাথাটা বেশী পরিষ্কার যাদবের : সংসারে মানুষের কাণ্ডকারখানাগুলি সে যেমন বুঝিতে পারে, বুঝাইতেও পারে তেমনি। জোরাল একটি ব্যক্তিত্ব থাকার জন্ত তার কথাগুলি লোকে বুঝিতেও চায়। কিন্তু, বাপকে বুঝাইতে গিয়া সেও হার মানিয়া যায়। তার বিকৃত মাথাটা কিছুতেই ছেলের ভাল মাথাটার এ ভাব স্বীকার করিতে চায় না। এক একটা সূত্র ধরিয়া এক এক দিকে নিজের বিকৃত কল্পনার রথটিকে চালাইতে থাকে।

তার সমস্ত বিকারের ভিত্তি ঐ দু'হাজার টাকা!

কোন্ চুলায় গিয়াছে সে টাকা ভগবান্ জানেন, দিবারাত্রি তার মনের মধ্যে ঐ টাকার চিন্তা পাক খাইয়া বেড়ায়। কখনও নিজের মনে ভাবে, কখনো ভাবনাগুলি শোনাইয়া বেড়ায় দশ-জনকে। অন্ত লোকে নিজেদের মধ্যে যখন যে বিষয়েই আলোচনাই করুক, পতিতপাবন সে আলোচনায় যোগ দিলে দু'হাজার টাকার কথা টানিয়া আনে—যে টাকাটা সে পুঁতিয়া রাখিয়াছে, আর যে টাকাটার দিকে পৃথিবীসুদ্ধ সকলের লোভ, আর যে টাকাটা দিয়া সে একদিন এই করিবে, ঐ করিবে, তাই করিবে।

টাকাটা যদি কোথাও পড়িয়া গিয়া থাকে, আর এমন কেহ যদি পাইয়া থাকে যে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া দু'হাজার টাকার লোভও সামলাইতে পারে, এই আশায় কয়েকটা কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কেমন করিয়া একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়িয়া যাওয়ায় পতিতপাবন চটিয়াই লাল। মাধবকে ডাকিয়া বলিল, কে দিয়েছে বিজ্ঞাপন, তুই?

হ্যাঁ। ভাবলাম, যদি কেউ কুড়িয়ে পেযে থাকে—

কুড়িয়ে পেয়ে থাকে! তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি রে, এঁ্যা? বলছি পুঁতে রেখেছি, কুড়িয়ে পাবে কি করে?

পুঁতে রেখেছ তো বুঝলাম—

বুঝলাম, কি বুঝলাম? বল পাজী বুঝলাম মানে কি, তোকে বলতে হবে।

পুঁতে যদি রেখে থাক, দেখাও দিকি কোথায পুঁতে রেখেছ? একবারটি শুধু দেখাও, তারপর তোমার যেখানে খুসী বেখে দিও টুঁ শব্দটি করব না। খালি মুখে বললেই তো হবে না পুঁতে রেখেছি!

রাগে পতিতপাবনের মুখের চামড়া কুঁচকাইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, তুই শযতানেব একশেষ মাধু, বজ্জাতের একশেষ। ভেবেছিস্ এমনি ফিকির করে টাকার খোঁজটা জেনে নিবি, বটে? বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দে মাধু ভাল চাস তো, আর শোন বলি তোকে, খবরদার আমার টাকার কথা তুই মুখে আনবি না। আমার টাকা, আমি যা খুসী করব, তোর কি?

যাদবও ভাবিয়া চিন্তিয়া টাকার সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিতে বাড়ীর লোককে বারণ করিয়া দিল। মিছামিছি পতিতপাবনকে উত্তেজিত করিযা তুলিয়া লাভ কি? ক্ষতি যা হওয়ার তা হইয়াছে, আর তা ফিরিবে না। টাকাটা যে কোথাও পোঁতা আছে, এ ভুল ভাঙিয়া গেলে বরং পতিতপাবনের মাথা আরও বিগড়াইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। তার চেয়ে তার এই ভুল ধারণাতে সায় দিয়া চলাই সকলের উচিত, হয় ত ধীরে ধীরে একদিন সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে।

অন্য ছুতায় অন্য পরিচয়ে বাড়ীতে আসিয়া একজন ডাক্তার একদিন পতিতপাবনের ব্যাপারখানা দেখিয়া গেলেন। বলিলেন যে, হঠাৎ মনে আঘাত লাগিয়া যে পাগলামী আসে, সেটা সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না, আস্তে আস্তে চলিয়া যায়। এমনও অনেক দেখা গিয়াছে যে, একবার একটা আঘাতে হঠাৎ যে বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছে, আর একবার অন্য একটা আঘাতে তেমনি হঠাৎ সে হইয়া উঠিয়াছে সুস্থ। যাদব বুঝি সেই পাগলের গল্প জানে না? সিঁড়িতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া মাথা ফাটিয়া যে অজ্ঞান হইয়া ছিল তিন দিন, তার পর যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ? বড় আশ্চর্য্য জিনিস মানুষের মাথাটা, বড় খাপছাড়া, বড় রহস্যময়। কিসে যে কখন কি হয়, কারো তা বলার ক্ষমতা নাই।

ডাক্তারির পর একটু কবিরাজী চিকিৎসা হইল। কখনও একটু ভাল মনে হইল পতিতপাবনকে, কখনও মনে হইল পাগলামী যেন বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, বিশেষ কিছু উন্নতি কোন চিকিৎসাতেই দেখা গেল না। বাড়ীর সকলের মন খারাপ হইয়া রহিল এবং উপদেশ ও পরামর্শ দিবার মস্ত একটা বিষয়বস্তু জুটিয়া গেল পাড়ার লোকের। পূজা, মানত ও মাদুলীর মধ্যে পূজা আর মানতগুলিই দেখা গেল সম্ভব, পতিতপাবনকে মাদুলী ধারণ করানোর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কে তাকে বলিবে যে, তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে, এই মাদুলীটা ধারণ কর, সারিয়া যাইবে?

ভয়ানক কিছু করিবার ঝোঁকও পতিতপাবনের আসে না, কতকগুলি বিষয়ে মাথাটাও সে মোটামুটি ঠিক রাখিয়া চলে,—এই যা একটা ভরসার কথা। অন্য পাগলের মত বাঁধিয়া রাখিতে হইলেই হইয়াছিল! প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে নিয়ম মত পেন্সনটাও সে লইয়া আসে, সময়মত স্নানাহার করে, সংসারের স্বাভাবিক গতিতে এমন কোন বাধা জন্মায় না যে, অন্য সকলকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হয়। রাত্রে যদি না ঘুমায়, অন্য কারো ঘুমের সে ব্যাঘাত করে না, বিড় বিড় যখন যা বকে, এত আস্তে জড়াইয়া জড়াইয়া কথাগুলি বলে যে সাধ করিয়া কান পাতিয়া না শুনিলে কারোর শুনিবার দরকার হয় না। দাড়িগোঁফে পতিত-পাবনের মুখখানা একরকম ঢাকিয়া গিয়াছে, তার চোখের দিকে চাহিলে কিন্তু একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। কেমন একটা জটিল দুর্বোধ্য রহস্য তাহার দুটি চোখে একটা অস্বাভাবিক বিচ্ছিন্ন জ্যোতির মত ঘনাইয়া আসিয়াছে; শিশুর চোখে যেন ফুটিয়া আছে শ্মশানচারী কাপালিকের দৃষ্টি।

পাগলামী পাগলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। পতিতপাবনের পাগলামী এমন বেমানান মনে হয়! এ অস্বাভাবিকতা যেন তার পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক, অনুচিত কিছু।

যাদব বলে, বাবা ভাল হয়ে যাবে, মা।

আমার যেমন অদেষ্ট!

সত্যি ভাল হয়ে যাবে। আমি একটা বুদ্ধি করেছি। কোন রকমে আমি যদি দুই হাজার টাকা যোগাড় করতে পারতাম!

মাধব একটা পঞ্চাশ টাকার চাকরী যোগাড় করিতে পারিল বটে, যাদবের পক্ষে দু'হাজার টাকা যোগাড় করার কোন ভরসাই দেখা গেল না। মাধবের চাকরী হওয়ায় ভাবিয়া চিন্তিয়া যাদব আর পড়া ছাড়িল না, কলিকাতায় এক কাকার অমত সত্বেও তার বাসায় উঠিয়া কলেজের কাটা নামটা জোড়া লাগাইয়া ভয়ঙ্কর পড়া আরম্ভ করিয়া দিল।

পড়িয়া পড়িয়া মরিয়া গেলেও টাকা হয় না যাদব তা জানে, কিন্তু কি আর করা যায়, আর কোন পথের সন্ধান তো সে রাখে না। কাকার বাড়ী ফাইফরমাস খাটিতে বলিলে যাদব খাটে না, গালাগালি দিলে শোনে না, খাইতে না ডাকিলে নিজে পাত পাড়িয়া বসিয়া খায় আর সপ্তাহে দু'সের ওজন কমানোর মত পড়ে। এমন অসাধারণ ভাল একটি ছেলে বাড়ীতে থাকিলে যদি বাড়ীর পাঠ-বিমুখ আড্ডাধারী ছেলে দুটির কিছু ভাল হয়, এই আশায় কাকার বাড়ীর সকলে শেষে যাদবের অপরাধগুলি ক্ষমা করিয়া ফেলে। এমন কি, কাকীমা একদিন মুখখানা হাসি হাসি করিয়া পর্য্যন্ত বলে, আচ্ছা বাবা তুই পড়, তোকে আর বাজারে যেতে হবে না।

ধরা-বাঁধা একটা নিয়মই আছে যে, পড়িতে পড়িতে যে যত রোগা হইতে পারিবে, সে তত ভালভাবে পাশ করিবে। সুতরাং যাদবের পরীক্ষার ফলটা হয় চমৎকার।

গ্র্যাজুয়েটত্ব অর্জ্জন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাইয়া যাদব পণপ্রথার বিরুদ্ধে যত আন্দোলন উঠিয়াছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভাল মেয়ে যদি পাওয়া যায় তো ভালই, যদি না পাওয়া যায় তাতেও ক্ষতি নাই—আর সমস্ত তার

গণ্ডায় গণ্ডায় বুঝিয়া পাওয়া চাই, আর চাই নগদ টাকা থেকে দু'হাজার।

একহাজার নশো নিরানব্বই হইলেও চলিবে না পূরাপূরি দু'হাজার।

যাদবের ভাবসাব দেখিলেও যেন কেমন কেমন লাগে। যেমন চেহারা ছিল, স্বভাব ছিল, সে রকম চেহারাও নাই, স্বভাবও নাই। আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। শান্তশিষ্ট ধীর প্রকৃতির ছেলেটার মধ্যে কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য আসিয়াছে বোঝা যায়, জীবনটা যার কাছে এতদিন ছিল সহজ ও সাধারণ, হঠাৎ তার যেন জীবন সম্বন্ধে গুরুতর একটা নেশা জন্মিযা গিয়াছে, সহজ বুদ্ধি-বিবেচনার মধ্যে মাথা তুলিয়াছে জোরালো ভাবপ্রবণতা।

মাধব বলে, তুই বড় বেহায়া, যদু! নিজের বিয়ের সম্বন্ধে এমন করে—

যাদব বলে, তুমি বোঝ না, দাদা! বিয়ের জন্য বিয়ে করছি না কি আমি? টাকার জন্য।

টাকার জন্য বিবাহ করিলে নিজের বিবাহ সম্বন্ধে যত দূর খুসী নির্লজ্জ হওয়া যায় এই রকম একটা ধারণা যাদবের মনে আছে। সে তাই মহোৎসাহে নিজের বিবাহের কথা আলোচনা করে, দেনা-পাওনার ফর্দ্দ দাখিল করে। ফর্দ্দ দেখিলেই বোঝা যায়, হাজার চারের কমে মেয়ের বাপের আর রেহাই নাই।

তা হোক। বাড়ী-ঘর না থাক, বাড়ীর অবস্থা ভাল না হোক, ছেলের বাপের মাথার ব্যারাম থাক, পরীক্ষা পাশ করিতে তো ছেলে অসাধারণ পটু। ঘটক একেবারে পাঁচ হাজার টাকার এক থলি আনিয়া হাজির করে। ভদ্রলোক নগদ দিতে রাজী থাকেন

তিন হাজার, ঘটকের তিনশ' বাদ দিলে যাহা হইতে বাকী থাকিবে দু হাজার সাতশ'।

যাদব বলে, ঠিক, এই তো চাই।

ছেলের বিবাহেও যে টাকা খরচ হয় এটা এতদিন তার খেয়াল হয় নাই কেন ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এই বেশ হইয়াছে। সাতশ' টাকা যা বেশী পাওয়া গেল সেই টাকার মধ্যেই বৌভাত ইত্যাদির খরচ মিটিয়া যাইবে, হাতে থাকিবে পুরাপুরি দুহাজার। কেবল দু' হাজার নগদ নিলে যে কাজের জন্য এত কাণ্ড করা সেই কাজটাই যে তার হইত না, দু' হাজারের কত খরচ হইয়া যাইত কে জানে!

যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। বৌ অবশ্য সুবিধার হইল না, সবদিকে সুবিধা হয়ও না। রঙ্ একটু কালো বৌএর, দেহ একটু স্থূল, মুখখানা একটু চ্যাপ্টা, আর বাঁ চোখটা এত ছোট যে, এ চোখে তার দৃষ্টি নাই। নামটা পর্য্যন্ত ভাল নয় বৌ-এর। কালিদাসী।

যাদব আগেই মেয়ে দেখিয়াছিল, তবু বিবাহের রাত্রে চোখে পলক ফেলিতে তার যেন একটু একটু কষ্ট হইতে লাগিল। উপবাস আর অনিদ্রায় যে রকম হয় তার চেয়ে অন্যরকম কষ্ট।

—তোমার ঘুম পেয়েছে?

বৌ মাথা নাড়িল।

—তোমার গালে কাটা দাগটা কিসের?

—ফোঁড়া হয়েছিল।

বোঝা গেল, মেয়ে দেখার সময় যেমন মনে হইয়াছিল বৌএর গলা তার চেয়েও কর্কশ। অতিরিক্ত লজ্জার ভেজালটা উপিয়া গেলে ও গলার স্বর কেমন শোনাইবে কে জানে!

একটা নিশ্বাস ফেলিতে গিয়া নিশ্বাসটা যাদব চাপিয়া গেল, কিন্তু প্রকাণ্ড হাইটাকে কোনমতে দমন করা গেল না।

বৌভাতের হাঙ্গামা চুকিয়া যাওয়ার পরদিন সকালবেলা পতিতপাবন বাড়ীর সামনে দাওয়ায় বসিয়া গম্ভীরমুখে তামাক টানিতেছিল। বাড়ীতে বিবাহের গণ্ডগোল সুরু হওয়ার পর হইতে সে কেমন চুপচাপ হইয়া আসিয়াছিল, কেমন একপ্রকার বিস্মিত দৃষ্টিতে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সকলের চলাফেরা হৈ চৈ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। কাল সারাদিন সে যেখানে ভোজ রান্না হইতেছিল, সেইখানে একখানা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছে, সন্ধ্যার পর হইতে বারান্দার এককোণে একটা টুলে ঠায় বসিয়া থাকিয়াছে অনেক রাত অবধি। বাড়ীর লোক অথবা নিমন্ত্রিতেরা কেহ কথা কহিলে কথার জবাবও দেয় নাই।

আজ সকালে অনেক দেরীতে উঠিয়া নীরবে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া চা-জলখাবার খাইয়া বাহিরে আসিয়া বসিয়াছে। চা সে কোনদিন খায় না, আজ চাহিয়া খাইযাছে। সকলে একটু অবাক্ হইয়া ভাবিয়াছে যে, না জানি এ আবার তার কোন্ নূতন ধরণের পাগলামীব পরিচয়!

তামাক টানিতে টানিতে সে কি ভাবিতেছিল সে-ই জানে, পুঁচকি আসিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিল, বাবা! বাবা! শীগ্‌গির এস, দেখে যাও কি কাণ্ড হয়েছে।

—কি হয়েছে রে, পুঁচকি?

হুঁকা রাখিয়া ব্যস্তভাবে পতিতপাবন উঠিয়া দাঁড়াইল।

পুঁচকির সঙ্গে উঠানে আসিয়া দেখিতে পাইল, উঠানের এককোণে যাদব শাবল দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে, আর চারিদিকে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া সকলে তাই চাহিয়া দেখিতেছে, কাছে গিয়া পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে রে, যদু ?

যাদব বলিল, বাবা, তোমার সেই দু'হাজার টাকা খুঁজে পেয়েছি। বাঁশ পুতবে বলে কানাই এখানে গর্ত্ত খুঁড়ছিল, হঠাৎ কিসে যেন শাবল লেগে শব্দ হল, টং—

বলিতে বলিতে গর্ত্তের ভিতরে হাত ঢুকাইয়া যাদব একটা বড় কাঁসার ঘটী বাহির করিয়া আনিল। ঘটীর মুখ শিলমোহর করা।

এর মধ্যে তোমার সেই দু'হাজার টাকা রেখেছিলে তো ?

পতিতপাবন খানিকটা হতভম্বের মত বলিল, আমার সেই দু'হাজার টাকা ?

এর মুখের দিকে তাকায় পতিতপাবন, ওর মুখের দিকে তাকায়, ভ্রূ কুঁচকাইয়া কি যেন ভাবিবার চেষ্টা করে।

আমার সে টাকা এখানে কোত্থেকে আসবে ? সে টাকা তো ব্যাঙ্কে জমা দেবার সময় চুরি গিয়েছে ?

সকলে স্তম্ভিত বিস্ময়ে পতিতপাবনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যাদব শুকমুখে বলিল, তুমি যে বল টাকা পুঁতে রেখেছ ?

পতিতপাবনের কুঁচকানো ভ্রূ আরও বেশী কুঁচকাইয়া গেল। সে চিন্তিতভাবে বলিল, বলি না কি ? আমারও ঐ রকম একটা কথা মনে হচ্ছিল। মাথাটা আমার যেন একটু কেমন কেমন লাগছিল কদিন থেকে, আমার অসুখবিসুখ কিছু করেছিল না কি রে ?

যাদব উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেখান হইতে সোজা দেখা যায়,

পুঁটির বৌ মস্ত দেহখানি লইয়া কৌতূহলভরে ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মোটা মোটা আঙুল দিয়া ঘোমটা ফাঁক করিয়া উঠানের ব্যাপারটা চাহিয়া দেখিতেছে।

যাদবের চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি একবার চারিদিক্ ঘুরিয়া আসিতে দু'চোখ তার হইয়া উঠিল জবাফুলের মত টকটকে লাল। বাপের মুখের দিকে কট কট করিয়া তাকাইয়া দাঁতে দাঁত ঘষিয়া সে বলিল, অসুখ? তোমার মত লোকের আবার অসুখ হয়? সব তোমার ঢং।

অন্য ছুতায় অন্য পরিচয়ে বাড়ীতে আসিয়া সেই ডাক্তার একদিন যাদবের ব্যাপারখানা দেখিয়া গেলেন। বলিলেন যে, হঠাৎ মনে আঘাত লাগিয়া যে পাগলামী আসে সেটা সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না, আস্তে আস্তে কমিয়া যায়। এমনও অনেক দেখা গিয়াছে যে, একবার একটা আঘাতে হঠাৎ যে বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছে, আর একবার অন্য একটা আঘাতে তেমনি হঠাৎ সে হইয়া উঠিয়াছে সুস্থ! পতিতপাবন বুঝি সেই পাগলের গল্প জানে না? সিঁড়িতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া মাথা ফাটিয়া যে অজ্ঞান হইয়া ছিল তিন দিন, তারপর যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ? বড় আশ্চর্য্য জিনিস মানুষের মাথাটা, বড় খাপছাড়া, বড় রহস্যময়। কিসে যে কখন কি হয় কারো তা বলার ক্ষমতা নাই।

সম্পূর্ণ

